ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

পরশুরামের লেখা
অন্যান্য গল্পের বই :

গড্ডলিকা—২৷৷০
কজ্জলী——২৷৷০
হনুমানের স্বপ্ন—২৷৷০
গল্পকল্প—২৷৷০

ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

মলাট : শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন—অংকিত



এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা- ১২

প্রকাশক
শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকাব অ্যান্ড সন্স, লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৯

মূল্য : ৩৲

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

সূচী

ধুস্তুরী মায়া

(দুই বুড়োর রূপকথা)

উদ্ধব পাল আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জগবন্ধু গাঙ্গুলীর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। উদ্ধব বেঁটে মোটা শ্যামবর্ণ, মাথায় টাক, কাঁচাপাকা ছাঁটা গোঁফ। উডমণ্ট স্ট্রীটে এঁর একটি ইমারতী রঙের বড় দোকান আছে, এখন দুই ছেলে সেটি চালায়। জগবন্ধু লম্বা রোগা ফরসা, গোঁফ দাড়ি নেই। ইনি জামরুলতলা হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। দুই বন্ধু দক্ষিণ কলকাতায় আবুহোসেন রোডে কাছাকাছি বাস করেন। ছেলেরা রোজগার করছে, মেয়েরা সুপাত্রে পড়েছে, সেজন্য সংসারের ভাবনা থেকে এঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল, শখও নানারকম আছে, সুতরাং বুড়ো বয়সে এঁদের বেশ আনন্দেই থাকবার কথা।

রোজ বিকাল বেলা এঁরা ঢাকুরের লেকে হেঁটে যান এবং জলের ধারে একটি বড় শিমুল গাছের তলায় বসে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত গল্প করেন, তার পর বাড়ি ফেরেন। দুজনেই সেকেলে লোক, সিগারেট চুরুট পাইপ পছন্দ করেন না। প্রত্যেকে একটা ঝুলিতে হুঁকো আর তামাক-টিকে-সাজানো দুটি কলকে নিয়ে যান এবং গল্প করতে করতে মুহুর্মুহু ধূমপান করেন।

বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা সাতটাতেও একটু আলো আছে। জগবন্ধু নিজের হুঁকো থেকে কলকেটি তুলে উদ্ধবের হাতে দিয়ে বললেন, আজ তোমার দাঁতের খবর কি?

উদ্ধব উত্তর দিলেন, তোমার সেই মাজনে কোনও উপকার হল না, পড়ে না গেলে কনকনানি যাবে না। তুমি খাসা আছ, দুপাটি বাঁধিয়ে মুড়ি কড়াইভাজা নারকেল গলদা চিংড়ি সবই চিবিয়ে খাচ্ছ। আমার তো পান সুদ্ধু ছাড়তে হয়েছে।

—ছেঁচে খাও না কেন?

—আরে ছ্যা, তাতে সবাই ভাববে একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে গেছি। তার চাইতে না খাওয়া ভাল। বুড়ো হওয়ার অশেষ দোষ।

—শুধু দোষ দেখছ কেন, ভালর দিকটাও দেখ। খাটতে হচ্ছে না, ছেলেরা সব করে দিচ্ছে। সবাই খাতির করে, কোথাও গেলে সব চাইতে আরামের চেয়ারটিতে বসতে দেয়, পাড়ায় সভা হলে তোমাকেই সভাপতি করে। গুরুজন নেই, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয় না, অন্য লোকেই প্রণাম করে।

—থামলে কেন, বলে যাও না। মেয়েরা সব দাদু জেঠা মেসো বলে, বুড়োদের দিকে আড় চোখে তাকায় না, আমরা যেন ইট পাথর গরু ছাগল।

—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

—ক্ষতি নয়? আমাদের পুরুষ মানুষ বলেই গণ্য করে না। দেখ জগু, জীবনটা বৃথাই কাটল।

—বৃথা কেন, তোমার কিসের অভাব? উপযুক্ত দুই ছেলে রয়েছে, গিন্নী রয়েছেন, ব্যাবসায় দেদার টাকা আসছে, শরীর ভালই আছে। তোমার ও দাঁত নড়া ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বাত ডায়াবিটিস ব্লাডপ্রেশার কিছুই নেই, এই বয়সেও নিমন্ত্রণে গিয়ে দু দিস্তে লুচি আর দেদার মাছ মাংস দই মিষ্টান্ন খেতে পার। আমি অবশ্য তোমার মতন মজবুত নই, বড়লোকও নই, কিন্তু দুঃখ করবারও কিছু নেই। ক জন বুড়ো আমাদের মতন ভাগ্যবান?

উদ্ধব পাল হুঁকোয় একটি দীর্ঘ টান দিয়ে কলকেটি বন্ধুর হাতে দিলেন। তার পর বললেন, দেখ জগু, যখন বয়স ছিল তখন কোনও ফূর্তিই করতে পাই নি। কর্তার হুকুমে ইস্কুলের পড়া শেষ না করেই দোকানে ঢুকেছি, ব্যাবসা আর রোজগার ছাড়া আর কিছুতে মন দেবার অবকাশ ছিল না।

জগবন্ধু গাঙ্গুলী বললেন, এখন তো দেদার অবকাশ, যত খুশি আনন্দ কর না।

—চেষ্টা করেছি, কিন্তু এই বয়সে তা হবার নয়। ছোঁড়াদের দেখে বাইসিকেল চড়ে সনসনিয়ে ছুটতে আর মোটর চালাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শক্তি নেই। আজকাল অ্যাং ব্যাং চ্যাং সবাই বিলেত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসছে। আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইংরিজী বলতে পারি না, হ্যাট-কোট পায়জামা-আচকান পরতে পারি না, কাঁটা-চামচ দিয়ে খেলে পেট ভরে না, কাজেই যাবার জো নেই। আবার সেকেলে ফুর্তিও সয় না। বছর চারেক আগে কাশীতে এক সাধুবাবার প্রসাদী বড়-তামাকের ছিলিমে একটি টান মেরেছিলুম, তার পর ঘণ্টা দুই ত্রিভুবন অন্ধকার। সেদিন আমার বেয়াই জগন্নাথ দত্তর বাগানে গিয়ে উপরোধে পড়ে চার গেলাস খেয়েছিলুম—রম-পঞ্চ না কি বললে। খেয়ে যাই আর কি, কেবল হেঁচকি আর হেঁচকি, তার পর বমি।

—ফুর্তিরও সাধনা দরকার, জোয়ান বয়স থেকে অভ্যাস করতে হয়। এখন আর ওসব করতে যেয়ো না।

—তার পর এই সেদিন তোমার সঙ্গে স্বপনপুরী সিনেমার 'লুটে নিল মন' দেখেছিলুম। দেখা ইস্তক মনটা খিঁচড়ে আছে। জীবনের যা সব চাইতে বড় সুখ—প্রেম, তাই আমার ভোগ হল না।

—অবাক করলে তুমি। বাড়ীতে সতীলক্ষ্মী গৃহিণী আছেন তবু বলছ প্রেম হয় নি! শাস্ত্রে বলে—জীর্ণমন্নং প্রশংসন্তি ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাম্। অর্থাৎ ভাত হজম হলে আর স্ত্রী বৃদ্ধা হলেই লোকে প্রশংসা করে। এখন না হয় দুজনে বুড়ো হয়েছ, কিন্তু প্রথম বয়সে প্রেম হয় নি এ কি রকম কথা?

—আমার বয়স যখন বারো তখনই বাবা সাত বছরের পুত্রবধু ঘরে আনলেন। খিদে না হতেই যদি খাবার জোটে তবে ভোজনের সুখ হবে কেমন করে? তা ছাড়া গিন্নীর মেজাজটি চিরকালই রুক্ষু, প্রেম করবার মানুষ তিনি নন। আর চেহারাটি তো তোমার দেখাই আছে। তবে হক কথা বলব, মাগী রাঁধে যেন অমৃত।

—কি রকম হলে তুমি খুশী হতে বল তো?

—যা হবার নয় তা বলে আর লাভ কি। তবু মনের কথা বলছি শোন। হুইল দেওয়া ছিপে যেমন করে রুই কাতলা ধরা হয় সেই রকম আর কি। ফাতনা নড়ে উঠল, টোপ গিলেই চোঁ করে সরে গেল, তার পর টান মেরে কাছে আনলুম, আবার সুতো ছাড়লুম, এই রকম খেলিয়ে খেলিয়ে বউ ঘরে তুলতে পারলেই জীবনটা সার্থক হত।

—ও, তুমি নটবর নাগর হয়ে প্রেমের মৃগয়া করতে চাও! এ বয়সে ওসব চিন্তা ভাল নয় ভাই। পত্নী যে ভাবেই ঘরে আসুন—কাঁচ বেলায় বা ধেড়ে বয়সে, প্রেমের আগে বা পরে—তিনি চিরকালই মার্গিতব্যা, অর্থাৎ খোঁজবার আর চাইবার জিনিস।

—কি বললে, মার্গিতব্যা? তা থেকেই বুঝি মাগী হয়েছে?

—তা জানি না, সুনীতি চাটুজ্যে মশাই বলতে পারেন।

উদ্ধব পাল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভড়াক ভড়াক করে তামাক টানতে লাগলেন।

যে শিমুল গাছের তলায় এ'রা বসেছিলেন তার উপরে একটা পাখি হঠাৎ ডেকে উঠল—ওঠ ওঠ ওঠ ওঠ। আর একটা পাখি সাড়া দিলে—উঠি উঠি উঠি উঠি।

উদ্ধব বললেন, কি পাখি হে? বেশ মজার ডাক তো।

প্রথম পাখিটা মোটা সুরে আবার ডাকল—ব্যাং ব্যাং গমী গমী গমী। অন্য পাখিটা মিহি সুরে উত্তর দিলে—ব্যাং ব্যাং গমা গমা গমা।

জগবন্ধু রোমাঞ্চিত হয়ে চুপি চুপি বললেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার!

উদ্ধব বললেন, ব্যাঙগমা ব্যাঙগমী নয় তো?

—চুপ চুপ। শুনে যাও কি বলছে।

ব্যাঙগমা ব্যাঙগমীর আলাপ শুরু হল। কলকাতার টেলিফোনের মতন অস্পষ্ট আওয়াজ, কিন্তু বোঝা যায়।

—নীচে কারা রয়েছে রে ব্যাঙগমী?

—দুটো বুড়ো।

—কি করছে ওরা?

—তামাক খাচ্ছে আর বক বক করছে।

—ও, তাই নাকে দুর্গন্ধ লাগছে আর কাশি আসছে। কি বলছে ওরা?

—একটা বুড়ো বলছে তার জীবনই বৃথা, প্রেম করবার সুবিধে পায় নি। আর একটা বুড়ো তাকে বোঝাচ্ছে।

—বুড়ো বয়স ধেড়ে রোগ ধরেছে। এই বলে ব্যাঙগমা তার সায়ংকালীন কোষ্ঠশুদ্ধি করলে। উদ্ধব আর জগবন্ধু রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একটু সরে বসলেন।

ব্যাঙগমী বললে, তোমার তো নানারকম বিদ্যে আছে, একটা উপায় বাতলে দাও না। আহা, বুড়ো বেচারার মনে বড় দুঃখু, যাতে তার শখ মেটে তার ব্যবস্থা কর।

ব্যাঙ্গমা বললে, জোয়ান হবার শখ থাকে তো তার প্রক্রিয়া বাতলাতে পারি, কিন্তু ওদের সাহস হবে কি? বোধ হয় পেরে উঠবে না।

—পারুক না পারুক তুমি বল না।

উদ্ধব ফিস ফিস করে বললেন, নোট করে নাও হে, নোট করে নাও। জগবন্ধু তাঁর নোটবুকে লিখতে লাগলেন।

ব্যাঙ্গমা বললে, ধুস্তুরী ছোলা। এক-একটি ছোলা খেলে দশ-দশ বছর বয়স কমে যায়।

—সে আবার কি জিনিস? কোথায় পাওয়া যায়?

—তৈরি করতে হয়। ওই বেড়ার দক্ষিণ দিকে নীল ধুতরোর ঝোপ আছে, তাতে বড় বড় ফল ধরেছে। কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় ধুতরো ফল চিরে তার ভেতরে ছোলা গুঁজে দিতে হবে, একটি ফলে একটি ছোলা। একাদশীব মধ্যে সেই ছোলা রস টেনে নিয়ে ফুলে উঠবে, তখন বার কবে নেবে। তার পর অমাবস্যা সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ছোলা চিবিয়ে খেয়ে সংকল্প করবে। মনে থাকে যেন, একটি ছোলায় দশ বছর বয়স কমবে, পাঁচটিতে পঞ্চাশ বছর।

—যদি দশ-বিশটা খায়?

—তবে পূর্বজন্মে ফিরে যাবে। তার পর শোন। সংকল্পের পর এই মন্ত্রটি বলে গঙ্গায় একটি ডুব দেবে—

বম মহাদেব ধুস্তুরস্বামী,
দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।

ডুব দেবা মাত্র বয়স কমে যাবে।

—আচ্ছা, যদি ফের আগের বয়সে ফিরে আসতে চায়?

—খুব সোজা। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বেলপাতা

চিবিয়ে খাবে, যটা ছোলা খেয়েছিল তটা বেলপাতা। তার পর এই মন্ত্রটি বলে একটি ডুব দেবে—

বম মহাদেব, সকল বস্তু
আগের মতন আবার অস্তু।

ব্যাঙগমা ব্যাঙগমী নীরব হল। আরও কিছু শোনবার আশায় খানিক ক্ষণ সবুর করে উদ্ধব বললেন, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। যা শোনা গেল তাই যথেষ্ট। প্রক্রিয়াটি যা বললে তা মালবীয়জীর কায়কল্পের চাইতে ঢের সোজা, বিপদের ভয়ও দেখছি না।

জগবন্ধু বললেন, ধুতরোর রস হচ্ছে বিষ তা জান?

—আরে ছোলার মধ্যে কতই আর রস ঢুকবে। ব্যাঙগমার কথা যদি মিথ্যেই হয় তবে বড় জোর একটু নেশা হবে। আমরা তো আর মুঠো খানিক ছোলা খাব না।

—তবে চল, দেখা যাক বেড়ার দক্ষিণে নীল ধুতরোর গাছ আছে কি না।

দুজনে গিয়ে দেখলেন, ধুতরো গাছের জঙ্গল, বড় বড় ফল ধরেছে। জগবন্ধু বললেন, বোধ হয় পরশু কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, বাড়ি গিয়ে পাঁজি দেখতে হবে। সেদিন ছোলা আর একটা ছুরি নিয়ে আসা যাবে।

পঞ্চমীর দিন উদ্ধব আর জগবন্ধু ধুতরোর বনে এসে দশ-বারোটা ফল চিরে তার মধ্যে ছোলা পুরে দিলেন। তার পরের কদিন তাঁরা নানারকম ভাবনায় আর উত্তেজনায় কাটালেন। জগবন্ধু অনেক বার বললেন, কাজটা ভাল হবে না। উদ্ধব বললেন, অত ভয় কিসের, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে! আমাদের

বরাত খুব ভাল তাই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর কথা নিজের কানে শুনেছি। আমার মনে হয় হরপার্বতী দয়া করে পাখির রূপ ধরে আমাদের হদিস বাতলে দিয়েছেন। এই বলে উদ্ধব হাত জোড় করে বার বার কপালে ঠেকাতে লাগলেন।

জগবন্ধু বললেন, আচ্ছা, জোয়ান না হয় হওয়া গেল, কিন্তু বাড়ির লোককে কি বলবে?

—বাড়িতে যাব কেন। খোঁজ না পেলে সবাই মনে করবে যে মরে গেছি। আমরা অন্য নাম নিয়ে অন্য জায়গায় থাকব। তুমি জগবন্ধুর বদলে জলধর হবে, আমি উদ্ধবের বদলে উমেশ হব। কেউ চিনতে পারবে না, নিশ্চিন্ত হয়ে ফুর্তি করা যাবে।

একাদশীর দিন তাঁরা ধুতরো ফল পেড়ে ভিতর থেকে ছোলা বার করে নিলেন। ছোলা ফুলে কুল আঁঠির মতন বড় হয়েছে। তার পর কদিন তাঁরা গোপনে নানা রকম ব্যবস্থা করে ফেললেন, যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের আর পরিবারবর্গের কোনও অভাব না হয়। উদ্ধব উমেশ পালের নামে ব্যাঙ্কে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে যাচ্ছিলেন। জগবন্ধু বললেন, যদি পরে ফিরে আসতে হয় তবে টাকাটা বার করতে পারবে না; উদ্ধব আর উমেশ পালের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট কর। উদ্ধব তাই করলেন।

চতুর্দশীর দিন জগবন্ধু বললেন, দেখ, বয়স কমাতে হয় তুমি কমাও। আমার কোনও দরকার নেই।

উদ্ধব বললেন, তা কি হয়, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারব না।

—বেশ, আমি কিন্তু দিন কতক পরেই ফিরে আসব।

—ফিরবে কেন, তোমারই তো সুবিধে বেশী। পরিবার বহুদিন গত হয়েছেন, নির্ঝঞ্ঝাটে আর একটি ঘরে আনবে।

—কটা ছোলা খেতে চাও হে?

—আমি বেশ করে ভেবে দেখলুম চারটে খাওয়াই ভাল। এখন আমাদের দুজনেরই বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। চল্লিশ বাদ গিয়ে হবে পঁচিশ, একেবারে তাজা তরুণ।

—কিন্তু বুদ্ধিও তো খাজা তরুণের মতন হবে। এত দিন ব্যাবসা করে যে বুদ্ধিটি পাকিয়েছ তা একটা খেয়ালের বশে কাঁচিয়ে দিতে চাও? আমি বলি কি, দুটো ছোলা খাও, তাতে বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হবে। প্রায় জোয়ানেরই মতন, অথচ বুদ্ধি বেশী কেঁচে যাবে না।

উদ্ধব নাক সিটকে বললেন, রাম বল। পঁয়তাল্লিশে কারবার ফালাও করা যেতে পারে, দেদার খদ্দেরও যোগাড় করা যেতে পারে, কিন্তু মনের মানুষ—ওই যাকে বলেছ মার্গিতব্যা—পাকড়াও করা যাবে না। আধবুড়োর কাছে কোনও মেয়ে ঘেঁষবে না। আচ্ছা, মাঝামাঝি করা যাক, তিনটে করে ছোলা খাওয়া যাবে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলে মন্দ হবে না। আজকাল তো ধেড়ে আইবুড়ো মেয়ের অভাব নেই।

একটু ভেবে জগবন্ধু বললেন, আচ্ছা উদ্ধব, তুমি তো নবকলেবর ধারণ করে উধাও হবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ। তোমার তিরোধান হলে পরিবারের কি দশা হবে ভেবে দেখেছ? তোমার দুঃখ হবে না?

—নাঃ। সম্পত্তি যখন রেখে যাচ্ছি তখন দুঃখ কিসের। তবে দিন কতক কান্নাকাটি করবে, তা না হলে যে ভাল দেখাবে না। গহনা খুলতে হবে, মাছ পেঁয়াজ পুঁই শাগ মসুর ডাল ছাড়তে হবে, তার জন্যও কিছু দিন একটু কষ্ট হবে। তার পর তোফা আলোচালের ভাত ঘি মটর ডাল পটোল ভাজা ঘন দুধ আম কলা সন্দেশ খেয়ে খেয়ে ইয়া লাশ হবে আর হরদম পান দোক্তা চিবুবে।

ঝাঁটা গোঁফের খোঁচা আর তামাকের গন্ধ সইতে হবে না, বেআক্কেলে মিনসের তোয়াক্কা রাখতে হবে না, মনের সুখে বউদের ওপর তম্বি করবে আর গুরু-মহারাজের সঙ্গে কাশী হরিদ্বার হিল্লি দিল্লি মক্কা ঘুরে বেড়াবে। ছেলে দুটো তো লাট হয়ে যাবে। বাপ পিতামহর বসত বাড়ি বেচে ফেলে ফরক হবে, মেট্রো প্যাটারেন ইমারত তুলবে, দামী দামী মোটর কিনবে। কারবারটা মাটি না করে এই যা চিন্তা। মরুক গে, আমি আর ওসব ভাবব না। আর তোমার তো কোনও ভাবনাই নেই। ছেলেটি অতি ভাল, তুমি সরে গেলে নিশ্চয় ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে।

—আমি কিন্তু তোমার একটা হিল্লে লেগে গেলেই ফিরে আসব। অবশ্য তোমার সঙ্গে রোজই দেখা করব।

—আগে কাঁচা বয়সের সোয়াদটা চেখে দেখ, তার পর যা ভাল বোধ হয় ক'রো।

উনিশে বৈশাখ বুধবার অমাবস্যা। সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধু দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপস্থিত হলেন। দুজনেই একটি করে ক্যাম্বিসের হালকা ব্যাগ নিয়েছেন, তাতে কিছু জামা কাপড় এবং অন্যান্য নিতান্ত দরকারী জিনিস আছে, আর যা দরকার পরে কিনে নেবেন। জগবন্ধু বললেন, উদ্ধব ভাই, আমার কথা শোন, আলেয়ার পিছনে ছুটো না, ঘরে ফিরে চল। বেশ আছ, সুখে থাকতে কেন ভূতের কিল খাবে।

উদ্ধব বললেন, সাহস না করলে কোনও কাজেই সিদ্ধি হয় না, ব্যাবসায় নয়, তুমি যাকে প্রেমের মৃগয়া বল তাতেও নয়। আর দেরি করবার দরকার কি, ঘাট থেকে লোকজন সব চলে গেছে, প্রক্রিয়াটি

সেরে ফেলা যাক। বেশী রাত পর্যন্ত এখানে থাকলে মন্দিরের লোকে নানারকম প্রশ্ন করবে।

উদ্ধব একটি গামছা পরে ঘাটের চাতালে জামা কাপড় জুতো রাখলেন। জগবন্ধুও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জলে নামবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বন্ধুর মুখে আর নিজের মুখে তিনটি করে ছোলা পুরে দিয়ে উদ্ধব বললেন, নাও, বেশ করে চিবিয়ে গিলে ফেল। এইবার মনে মনে সংকল্প কর।......হয়েছে তো?

তার পর জগবন্ধুর হাত ধরে জলে নেমে উদ্ধব বললেন, এস, দুজনে এক সঙ্গে মন্ত্রটি বলে ডুব দেওয়া যাক।— বম মহাদেব ধুস্তুরস্বামী, দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।

জল থেকে উঠে গা মুছতে মুছতে জগবন্ধু প্রশ্ন করলেন, কি রকম বোধ হচ্ছে? যে অন্ধকার, তোমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। একটা টর্চ আনলে হত।

উদ্ধব কাপড় পরতে পরতে বললেন, বম ভোলানাথ, কেয়া বাত কেয়া বাত! মাথায় আবার চুল গজিয়েছে হে। শরীরটা খুব হালকা হয়ে গেছে, লাফাতে ইচ্ছে করছে। দাঁতের বেদনাও নেই। ধন্য ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী! যদি ধরা দিতে তবে সোনার খাঁচায় রেখে বাদাম পেস্তা আঙুর বেদানা খাওয়াতুম। তোমার কি রকম হল হে?

—বাঁধানো দাঁত খসে গেছে, দুপাটি নতুন দাঁত বেরিয়েছে, গায়েও জোর পেয়েছি। আলো জেবলে আরশিতে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না।

—চল যাওয়া যাক, কলকাতার বাস এখনও পাওয়া যাবে। বউবাজারে তরুণধাম হোটেলে ঘর খালি আছে, আমি খবর নিয়েছি। এখন সেখানেই উঠব। তার পর সুবিধে মতন একটা বাড়ি নেওয়া যাবে।

হোটেলে এসে আরশিতে মুখ দেখে উদ্ধব বললেন, এঃ, বয়স কমেছে বটে, কিন্তু চেহারাটা গুণ্ডা গুণ্ডা দেখাচ্ছে। তোমার তো দিব্বি রূপ হয়েছে জগু, একবারে কার্তিক। দেখো ভাই, আমার শিকার তুমি যেন কেড়ে নিও না।

জগবন্ধু বললেন, আমি শিকার করতে চাই না।

—বেশ বেশ, তুমি শুকদেব গোসাঁই হয়ে তপস্যা ক'রো। এখন আমার মতলবটা শোন। প্রেমের মৃগয়া তো করবই, কিন্তু তাতে দিন কাটবে না। রসা রোডে একটা নতুন রঙের দোকান খুলব, পাল অ্যাণ্ড গাঙ্গুলী। তুমি বিনা মূলধনে অংশীদার হবে, লাভের বখরা পাবে। ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা নতুন অ্যাকাউণ্টে জমা আছে। দেখবে ছ মাসের মধ্যে নতুন কারবারটি ফাঁপিয়ে তুলব। মনে থাকে যেন—তুমি হচ্ছ জলধর গাঙ্গুলী, আমি উমেশ পাল। রাত অনেক হয়েছে, এখন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়া যাক।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে জগবন্ধু বললেন, এখন কি করতে চাও বল।

উদ্ধব বললেন, সমস্ত রাত ভেবেছি, ঘুমুতে পারি নি। শুনেছি বালিগঞ্জ আর নতুন দিল্লিই হচ্ছে প্রেমের জায়গা। দিল্লি তো বহু দূর, আমি বলি কি, বালিগঞ্জেই আস্তানা করা যাক।

—ওখানে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। তোমার বয়স কমেছে বটে, পুরো তরুণ না হলেও হাফ তরুণ হয়েছ, কিন্তু তোমার চাল-চলন সাবেক কালের, ফ্যাশন জান না, লেখাপড়াও তেমন শেখ নি। কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমার পালিশের অভাব আছে। ওদিককার মেয়েরা ইংরিজী ফ্রেঞ্চ বলে, বিলিতী কবিতা আওড়ায়। আবার শুনেছি পেণ্টুলুন পরে, ভুরু কামায়, রং মাখে, বল নাচে, সিগারেট খায়, মোটর হাঁকায়। আই সি এস, আই এ এস, বিলাত

ফেরত ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকরে ছাড়া আর কারও দিকে ফিরেও তাকায় না।

—তাদের চাইতে আমার টাকা ঢের বেশী, রোজগারও বেশী করতে পারব। ভাল বাড়ি, আসবাব, মোটর, কিছুরই অভাব হবে না।

—তা মানলুম। কিন্তু তুমি টেবিলে বসে ছুরি-কাঁটা-চামচ চালাতে পারবে? হাপুস-হুপুস শব্দ না করে তো খেতেই পার না। শুনেছি কড়াইশুঁটির দানা আর বড়ি ভাজা ছুরি দিয়ে তুলে মুখে তোলাই আধুনিক দস্তুর। তা তুমি পারবে?

—চিমটে দিয়ে তুলে খেলে চলবে না?

—না। তা ছাড়া তুমি টেবিল ক্লথে ঝোল ফেলে নোংরা করবে, তা দেখলেই তোমার মার্গিতব্যা মারমুখো হবেন।

—বেশ, তুমিই বল কোথায় সুবিধে হবে।

—খবরের কাগজে গাদা গাদা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বার হয়। তা থেকেই বেছে নিতে হবে। এই তো আজকের কাগজ রয়েছে, পড় না।

উদ্ধব পড়তে লাগলেন।—বুলবুলি, লক্ষ্মী বোন আমার, ফিরে এস, বাবা মা শোকে শয্যাশায়ী। খঞ্জনকুমারের নাচের পার্টিতেই তুমি যোগ দিও। আরে গেল যা! ...... বাবা নেংটু, বাড়ি ফিরে এস, ম্যাট্রিক দিতে হবে না, সিনেমাতেই তোমাকে ভর্তি করা হবে। আরে খেলে যা!

জগবন্ধু বললেন, ওসব কি পড়ছ, পাত্র-পাত্রীর কলম পড়।

—এম এ পাশ, স্বাস্থ্যবতী বাইশ বৎসরের গৃহ পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বরপণ যোগ্যতা অনুসারে। ...... সুন্দরী নৃত্যগীতনিপুণা বিশ বৎসরের আই এ, নৈকষ্য কুলীন মুখোপাধ্যায়

পাত্রীর জন্য আই সি এস পাত্র চাই।......দেখ জগু, এসব চলবে না, সেই মামুলী বর-কনের সম্বন্ধ স্থির করে বিয়ে, শুধু বয়সটাই বেড়ে গেছে আর তার সঙ্গে নৃত্য-গীত, এম এ, বি এ যোগ হয়েছে। অন্য উপায় দেখ।

—আচ্ছা, এই রকম একটা বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপালে কেমন হয়।— পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক উদারপ্রকৃতি সদ্‌বংশীয় বাঙালী বহু-লক্ষপতি ব্যবসায়ী, কোনও আত্মীয় নাই, বিবাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরী মহিলার সহিত আলাপ করিতে চান। অসবর্ণে আপত্তি নাই। উভয় পক্ষের মনের মিল হইলে শীঘ্রই বিবাহ। বক্স নম্বর অমুক।

—খাসা হয়েছে, ছাপবার জন্য আজই পাঠিয়ে দাও।

বিজ্ঞাপন বার হবার তিন-চার দিন পর থেকেই রাশি রাশি উত্তর আসতে লাগল। একটি চিঠি এই রকম।—৫নং ঘুঘু-ব্যাগান রোড, কলিকাতা। টেলিফোন নর্থ ২৩৪। মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানাইতেছি যে কাতলামারি এস্টেটের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানী আপনার সহিত আলাপ করতে ইচ্ছুক। ইনি পরমাসুন্দরী এবং অশেষ গুণবতী। ইণ্টারভিউএর সময় সন্ধ্যা সাতটা হইতে আটটা। ইতি। শ্রীরামশশী সরকার, সদর নায়েব।

উদ্ধব বললেন, ভালই মনে হচ্ছে, তবে পাত্রীর নামটা বিদকুটে। আর এস্টেটটি নিশ্চয় ফোঁপরা তাই রাজকুমারী ধনী বর খুঁজছেন। তা হক। হোটেলে তো টেলিফোন আছে, এখনই জানিয়ে দেওয়া যাক আজ সন্ধ্যায় আমরা দেখা করতে যাব।

জগবন্ধু বললেন, তোমার দেখছি তর সয় না। একটা চিঠি

লিখে দাও না যে পরশু যাবে। তাড়াতাড়ি করলে ভাববে তোমার গরজ খুব বেশী।

—তুমি বোঝ না, কোনও কাজে গড়িমসি ভাল নয়।

উদ্ধব টেলিফোন ধরে ডাকলেন, নর্থ টু থ্রি ফোর।......ইয়েস। একটু পরে মেয়েলী গলায় সাড়া এল, কাকে চান?

—শ্রীযুক্তেশ্বরী আছেন কি? আমি হচ্ছি উমেশ পাল, আলাপের জন্য আমিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম।

—ও, আপনি একজন ক্যাণ্ডিডেট?

উদ্ধব একটু গরম হয়ে বললেন, ক্যাণ্ডিডেট আপনাদের রাজকুমারী, তাঁর তরফ থেকেই তো বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত পেয়েছি।

—দরখাস্ত বলছেন কেন। আমিই রাজকুমারী, আপনি দেখা করতে চান তো আজ সন্ধ্যায় আসতে পারেন।

উদ্ধব নীচু গলায় জগবন্ধুকে বললেন, জানিয়ে দিই যে আমরা দুজনে যাব, কি বল? জগবন্ধু বললেন, আরে না না, এসব ব্যাপারে সঙ্গী নেওয়া চলে না।

উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাজকুমারী বললেন, হেলো।

উদ্ধব জবাব দিলেন, কিলো।

—ও আবার কি রকম! ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কইতে জানেন না?

—খুব জানি। আলাপ তো হবেই, এখনই শুরু করলে দোষ কি। আজই সন্ধ্যায় আপনার কাছে যাব।

—আপনাকে বকাটে ছোকরা বলে মনে হচ্ছে।

—ঠিক ধরেছেন। বয়স যদিচ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু স্বভাব কুড়ি-পঁচিশের মতন। দেখুন, আপনার গলার সুরটি খাসা। চেহারাটিও ওই রকম হবে তো?

—দেখতেই পাবেন। মশাই নিজে কেমন?

—চমৎকার। দেখলেই মোহিত হয়ে যাবেন।

টেলিফোনের আলাপ শেষ হলে জগবন্ধু বললেন, হাঁ হে উদ্ধব, ভুলে তিনটের জায়গায় চার-পাঁচটা ছোলা খেয়ে ফেল নি তো? ফাজিল ছোকরার মতন কথা বলছিলে।

—তিনটেই খেয়েছিলুম। কি জান, ছেলেবেলায় বাবার শাসনে কোনও রকম আড্ডা দেওয়া বা বকামি করবার সুবিধে ছিল না। এখন আবার কাঁচা বয়সে এসে ফুর্তি চাগিয়ে উঠেছে। তুমি কিছু ভেবো না, আমার বুদ্ধি ঠিক আছে, বেচাল হবে না।

জগবন্ধু কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না, অগত্যা উদ্ধব একলাই রাজকুমারী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানীর কাছে গেলেন। বাড়িটা জীর্ণ, অনেক কাল মেরামত হয় নি, সামনের বাগানেও জঙ্গল হয়েছে। বৃদ্ধ নায়েব রামশশী সরকার উদ্ধবকে একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একটু পরে পাশের পর্দা ঠেলে স্পন্দচ্ছন্দা এলেন।

উদ্ধব স্থির করে এসেছেন যে হ্যাংলামি দেখাবেন না। রসিকতা করবেন বটে, কিন্তু মুরুব্বীর চালে। হলেনই বা রাজকুমারী, উদ্ধব নিজেও তো কেও-কেটা নন।

ঘরের ল্যাম্প শেড দিয়ে ঢাকা সেজন্য আলো কম। উদ্ধব দেখলেন, স্পন্দচ্ছন্দা লম্বা, দোহারা, কিন্তু মাংসের চেয়ে হাড় বেশী। মেমের চাইতেও ফরসা, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট, লাল নখ, চাঁচা ভুরু, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা কোঁকড়ানো চুল, নীল শাড়ি। জগবন্ধুর শিক্ষা অনুসারে উদ্ধব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, নমস্কার।

—নমস্কার। আপনি বসুন।

—ইয়ে, দেখুন শ্রীযুক্তেশ্বরী রাজকুমারী পণ্ডচণ্ডা দেবী—

—স্পন্দচ্ছন্দা।

—হাঁ হাঁ, স্পন্দচ্ছন্দা। দেখুন, একটি কথা গোড়াতেই নিবেদন করি। আপনার নামটা উচ্চারণ করা বড় শক্ত, আমি হেন জোয়ান মরদ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। যদি আপনাকে পদীরানী বলি তো কেমন হয়?

—স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমিও আপনাকে উম্‌শে বলব।

—সেটা কি ভাল দেখাবে? প্রজাপতির নির্বন্ধে আমি তো আপনার স্বামী হতে পারি। হবু স্বামীকে নাম ধরে ডাকা আমাদের হিঁদু ঘরের দস্তুর নয়।

স্পন্দচ্ছন্দা হি হি করে হেসে বললেন, আপনি দেখছি অজ পাড়াগেঁয়ে।

—আমি আসল শহুরে, চার পুরুষ কলকাতায় বাস। আপনিই তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন। বেশ, নাম ধরেই ডাকবেন, তাতে আমার ক্ষতিটা কি। এখন কাজের কথা শুরু হক। আমার চেহারাটা কেমন দেখছেন?

—মন্দ কি। একটু বেঁটে আর কালো, তা সেটুকু ক্রমে সয়ে যাবে। আমাকে কেমন দেখছেন?

—খাসা, যেন পটের বিবিটি। অত ফরসা কি করে হলেন?

—আমার গায়ের রংই এই রকম।

উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন, ওগো চণ্ডপণ্ডা পদীরানী, রঙের ব্যাপারে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ওই হল আমার ব্যাবসা। তুমি এক কোট অস্তরের ওপর তিন পোঁচ পেণ্ট চড়িয়েছ—হবক্‌স জিঙ্ক, একটু পিউড়ি, আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু জমির আদত রংটি কেমন?

—আপনি অতি অসভ্য।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গায়ের রং তোমারই থাক, আমার তা জানবার দরকার কি। তবে একটা কথা বলি—মূর্তিটা কুমোরটুলি ঢঙের করতে পার নি। যদি আরও বেশী পিউড়ী কি এলামাটি দিতে আর চোখের কাজলটা কান পর্যন্ত টেনে দিতে তবেই খোলতাই হত।

—আপনি নিজে কি মাখেন? আলকাতরা?

উদ্ধব সহাস্যে বললেন, সরষের তেল ছাড়া কিছুই মাখি না। আমার হচ্ছে খোদ রং, নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষলেও উঠবে না, একেবারে পাকা। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবে না। বয়সও ভাঁড়াতে চাই না, ঠিক পঁয়ত্রিশ। তোমার কত?

—বাইশ।

—উঁহু, বেয়াল্লিশ।

স্পন্দচ্ছন্দা চেঁচিয়ে বললেন, বাইশ!

আরও চেঁচিয়ে টেবিলে কিল মেরে উদ্ধব বলেন, বেয়াল্লিশ!

—আপনি আমার অপমান করছেন?

—আরে না না, একটু দরদস্তুর করছি। আচ্ছা, তোমার কথা থাকুক, আমার কথাও থাকুক, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। তোম্যর বয়স বত্রিশ।

স্পন্দচ্ছন্দা মুখ ভার করে বলেন, বেশ, তাই না হয় হল।

—লেখাপড়া কদ্দুর? মাছ-তরকারি ধোবার হিসেব এসব লিখতে পারবে?

নাকটি ওপর দিকে তুলে স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, মেমের কাছে এম এ ক্লাসের চাইতে বেশী পড়েছি। মশায়ের বিদ্যে কতদূর?

—ফোর্থ কেলাস পর্যন্ত। তবে রবিঠাকুর জানি—ওরে দুরাচার হিন্দু কুলাঙ্গার, এই কি তোদের—

কানে আঙুল দিয়ে স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, থাক থাক, খুব হয়েছে। আয় কত?

—তোমার কোনও চিন্তা নেই। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবে যে আমার দেদার টাকা আছে। বাড়ি, গাড়ি, আসবাব, গহনা, সব তোমার মনের মতন হবে। তোমার এস্টেটের আয় কত?

—পাকিস্থানে পড়েছে, অনেক কাল আদায় হয় নি। তবে ভাবনার কিছু নেই। খাঁ সায়েব বদরুদ্দিন আমার বাবার বন্ধু, তিনি বলেছেন সব আদায় করে দেবেন।

—তবেই হয়েছে। বেচে ফেল, বেচে ফেল।

—বেশ তো। আপনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা। বৈষয়িক আলাপ তো এক রকম হল, এখন একটু প্রেমালাপ করা যাক। দেখ পদ্মীরানী, আমার সঙ্গে দু দিন ঘর করলেই টের পাবে আমি কি রকম দিলদরিয়া চমৎকার লোক। স্পষ্ট করে বল দিকি—আমাকে মনে ধরেছে?

—তা ধরেছে।

একজন প্যাণ্ট-শার্ট পরা আধাবয়সী ভদ্রলোক পাইপ টানতে টানতে ঘরে ঢুকলেন। স্পন্দচ্ছন্দা দু পক্ষের পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি হচ্ছেন মিস্টার মকর রায়, বার-অ্যাট-ল, সম্পর্কে আমার দাদা হন। আর ইনি উমেশ পাল, খুব ধনী পেণ্ট মার্চেণ্ট, আমার ভাবী বর।

মকর রায় বললেন, আরে তাই নাকি! এঁরই না আজ আসবার কথা ছিল? বাহাদুর লোক, এসেই হৃদয় জয় করেছেন, একেবারে ব্লিৎস ক্রিগ। কংগ্রাচুলেশন মিস্টার পাল, লাকি ডগ, ভাগ্যবান কুত্তা! এই বলে উদ্ধবের হাত সজোরে নেড়ে দিলেন। তার পর বললেন, স্পন্দার মতন মেয়ে লাখে একটি মেলে না মশাই, নাচ গান অ্যাকটিং

সব তাতে চৌকস। সিনেমার লোকে সাধাসাধি করছে। এর কাঁচ-পোকা-নৃত্য যদি দেখেন তো অবাক হয়ে যাবেন।

—কাঁচপোকা নাচে নাকি?

—যখন তখন নাচে না, আরসোলা ধরবার সময় নাচে।

স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, জান মকর-দা, মিস্টার পাল হচ্ছেন একজন আদিম হি-ম্যান।

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন, সে আবার কাকে বলে? হি-গোটই তো জানি।

মকর রায় বললেন, হি-ম্যান জানেন না? মদ্দা পুরুষ। আমাদের ঋষিরা যাকে বলতেন নরপুংগব বা পুরুষর্ষভ, অর্থাৎ যিনি ষাঁড়ের মতন শিং বাগিয়ে সোজা ছুটে গিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যান। দেখুন মিস্টার পাল, যদি রঙের কারবার বাড়াতে চান তো আমাকে বলবেন। হুণ্ডাগড় স্টেটের সমস্ত খনি আমার হাতে, অজস্র গেরি মাটি আর এলা মাটি আছে। দু লাখ যদি ঢালেন তবে এক বছরেই তিন লাখ ফিরে পাবেন। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, আপনারা এখন আলাপ করুন, আমি ওপরে গিয়ে বসছি।

উদ্ধব বললেন, আরে না না, এইখানেই বসুন। আমার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই মশাই, বিশেষত আপনি যখন সম্পর্কে শালা। দেখুন মকরবাবু, আপনার এই বোনটি হচ্ছেন আমার মার্গিতব্যা।

—সে আবার কি চিজ?

—জানেন না? চিরকাল খোঁজবার আর চাইবার জিনিস। একজন হেডমাস্টার কথাটির মানে বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, আজকের মতন উঠি, তামাক খেতে হবে, আপনাদের এখানে তো সে পাট নেই। না না, সিগারেট ফিগারেট চলবে না, গুড়ুক চাই। কাল বিকেলে আবার

আসব, গড়গড়া আর তামাকের সরঞ্জামও সব নিয়ে আসব। হাঁ, ভাল কথা—আমার আর একটু জানবার আছে। হ্যাঁগা পদ্মীরানী, শুক্ত, মোচার ঘণ্ট, ছোলার ডালের ধোঁকা—এসব রাঁধতে জান?

স্পন্দচ্ছন্দা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, ওসব আমি খাই না।

—আমি খেতে ভালবাসি। আচ্ছা, মাগুর মাছের কালিয়া, ইলিশের পাতুড়ি, ভাপা দই—এসব করতে জান?

—ও তো বাবুর্চীর কাজ।

—তবে কি ছাই জান! এসব রান্না বাবুর্চীর কাজ নয়, গিন্নীরই করা উচিত। তোমার নাচ দেখে তো আমার পেট ভরবে না।

—ও, আপনি রাঁধুনী গিন্নী চান! একটা কেষ্টদাসী কি কালিদাসী ঘরে আনলেই পারতেন।

হঠাৎ রেগে গিয়ে উদ্ধব বললেন, কি বললে! কালিদাসীর সামনে তুমি দাঁড়াতে পার নাকি?

—অত রাগ কেন মশাই, তিনি বুঝি আপনার আগেকার গিন্নী?

উদ্ধব গর্জন করে বললেন, আগেকার কি, দস্তুর মত জলজ্যান্ত এখনকার! তার কাছে তুমি? তরমুজের কাছে তেলাকুচো, কামধেনুর কাছে মেনী বেরাল!

স্পন্দচ্ছন্দা চিৎকার করে বললেন, অ্যাঁ, এক স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করতে এসেছ? ঠক জোচ্চোর, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!

মকর রায় বললেন, যাবে কোথায়! রীতিমত ক্রিমিনাল কাণ্ড, ধাপ্পা দিয়ে রাজকন্যা আর রাজ্য আদায় করতে এসেছে। থাম, মজা টের পাইয়ে দেব।

উদ্ধব দাঁত খিঁচিয়ে কিল দেখিয়ে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমস্ত শুনে জগবন্ধু বললেন, ব্যাপারটা ভাল হল না। ওরা অমনি ছাড়বে না, তোমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করবে।

উদ্ধব বললেন, গিন্নীর নামটা শুনে হঠাৎ কেমন মন খারাপ হয়ে গেল, সামলাতে পারলুম না। তা যাক গে, কি আর করবে।

দু দিন পবে সলিসিটার গুঁই অ্যান্ড হুঁই-এর চিঠি এল।—রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানীকে যে মানসিক আঘাত দেওয়া হয়েছে এবং তজ্জনিত তাঁর যে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে তার খেসারত স্বরূপ এক লক্ষ টাকা তিন দিনেব মধ্যে পাঠানো চাই, অন্যথায় উমেশ পালের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করা হবে।

জগবন্ধু বললেন, মুশকিলে ফেললে দেখছি। মকদ্দমার ফল যাই হক, হয়রানি আর কেলেংকারি হবে। ভাবিয়ে তুললে হে!

উদ্ধব বললেন, ভাবনা কিসেব। মোক্ষম উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। ব্যাঙগমার কথা মনে নেই?

জগবন্ধু সোৎসাহে বললেন, রাজী আছ তুমি?

—খুব রাজী। শখ মিটে গেছে, হোটেলেব জঘন্য রান্না আব খেতে পারি না। দেখ তো পূর্ণিমা কবে।

পাঁজি দেখে জগবন্ধু বললেন, আজই তো!

সন্ধ্যার সময় দুজনে দক্ষিণেশ্বরেব ঘাটে এলেন এবং তিনটি বেলপাতা চিবিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন—বম মহাদেব সকল বস্তু আগের মতন আবার অস্তু। বলেই একটি ডুব দিলেন।

ঘাটে উঠে মাথা মুছতে মুছতে উদ্ধব বললেন, ওহে জগু, আবার দিব্যি একমাথা টাক হয়েছে, শরীরটাও আড়াইমনী হয়ে গেছে। তোমার কেমন হল?

জগবন্ধু বললেন, আমারও মুখে দুপাটি নকল দাঁত এসে গেছে। সব তো হল, এখন বাড়ি গিয়ে বলবে কি? দু হপ্তা আমরা গায়েব হয়ে আছি, তার একটা ভাল রকম কৈফিয়ত দেওয়া চাই।

—সে তুমি ভেবো না। তুমি তা পারবেও না, চিরকাল মাস্টারি করে ছেলেদের শিখিয়েছ—সদা সত্য কথা কহিবে। যা বলবার আমিই বলব। আজ রাতে আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, হোটেলে ফিরে চল।

হোটেলে এসে দেখলেন, তাঁদের ঘরে চার জন বিছানা পেতে শুয়ে আছে। উদ্ধব ম্যানেজারকে বললেন, আচ্ছা লোক তো আপনি, কিছু না জানিয়ে আমাদের রিজার্ভ করা ঘরে অন্য লোক ঢুকিয়েছেন! এর মানে কি?

ম্যানেজার আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে আপনারা?

—ন্যাকা, চিনতে পারছেন না! উমেশ পাল আর জলধর গাঙ্গুলী। উনিশে বোশেখ, মানে দোসরা মে বুধবার থেকে দু হপ্তা এই ঘর আমাদের দখলে আছে।

—দু হপ্তা বলছেন কি মশাই, নেশা করেছেন নাকি? আজই তো বুধবার দোসরা মে উনিশে বোশেখ।

উদ্ধবকে টেনে নিয়ে রাস্তায় এসে জগবন্ধু বললেন, সবই ধুস্তুরী মায়া। গত দু হপ্তা জগতের ইতিহাস থেকে একবারে লোপ পেয়ে গেছে। এখন বাড়ি চল।

রাত প্রায় বারোটার সময় জগবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধব নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন। উদ্ধব-গৃহিণী কালিদাসী তারস্বরে বললেন, বলি দুপুর রাত পর্যন্ত দুই ইয়ারে ছিলে কোন্ চুলোয়? ওঁর লক্ষ্মী না হয় ছেড়ে গেছে, তোমার তো ঘরে একটা

আপদ-বালাই আছে। দেরি দেখে মানুষটা ভেবে মরছে সে হুঁশ হয় নি বুঝি?

উদ্ধব হাঁপাতে হাঁপাতে কান্নার সুরে বললেন, ওঃ গিন্নী, তোমার শাঁখা-সিঁদুরের জোরে আর এই জগু ভাইএর হিম্মতে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘাটে গঙ্গার ধারে বসেছিলুম। ভাবলুম মুখ হাত পা ধুয়ে নিই, তার পর মায়ের আরতি দেখব। যেমন জলে নাবা অমনি এক মস্ত কুমির পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল—

উদ্ধবের দু পায়ে হাত বুলিয়ে কালিদাসী বললেন, কই দাঁত বসায় নি তো!

—ফোকলা কুমির গিন্নী, একদম ফোকলা। ভাগ্যিস কুমিরটা বুড়ো ছিল তাই পা বেঁচে গেছে। আমার বিপদ দেখে জগু লাঠি নিয়ে লাফিয়ে জলে পড়ল। এক হাতে সাঁতার দেয়, আর এক হাতে ধপাধপ লাঠি চালায়। শেষে চাঁদপাল ঘাটে এসে কুমিরটা মারের চোটে কাবু হয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তার পর এক ময়রার দোকানে উনুন-পাড়ে বসে জামাকাপড় শুকিয়ে ঘরে ফিরেছি।

কালিদাসী বললেন, মা দক্ষিণেশ্বরী রক্ষা করেছেন, কালই পুজো পাঠাব। রান্না সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে, গরম করে দিচ্ছি, লুচিও এখনি ভেজে দিচ্ছি। ততক্ষণ তোমরা মুখ হাত পা ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও। গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ি খবর পাঠাচ্ছি, উনি এখানেই খেয়ে দেয়ে যাবেন এখন।

উদ্ধব বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, এখানেই খাবে হে জগু, এখানেই খাবে। গিন্নীর রান্না তো নয়, অমৃত।

১৩৫৭

রামধনের বৈরাগ্য

সাহিত্যগগনে উড়ন-তুবড়ির মতন রামধন দাসের উত্থান যেমন আশ্চর্য তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধানও সেই রকম। কিন্তু এখন তাঁর নাম কেউ করে না, কারণ বাঙালী পাঠক অতি নিমকহারাম। তারা জয়ঢাক পিটিয়ে যাকে মাথায় তুলে নাচে, চোখের আড়াল হলেই কিছু দিনের মধ্যে তাকে ভুলে যায়। রামধনেরও সেই দশা হয়েছে। এককালে তিনি অদ্বিতীয় কথাসাহিত্যিক বলে গণ্য হতেন, তাঁর খ্যাতির সীমা ছিল না, রোজগারও প্রচুর করতেন। তার পর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁর ভক্তপাঠকরা এবং সপক্ষ বিপক্ষ লেখকরা অনুসন্ধানের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু ঠিক খবর কিছুই পাওয়া গেল না। কেউ বলে নোবেল প্রাইজের তদবির করবার জন্য তিনি বিলাতে আছেন, কেউ বলে সাহিত্যিক গুন্ডারা তাঁকে গুম-খুন করেছে, কেউ বলে সোভিয়েট সরকার তাঁকে মোটা মাইনে দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে, তিনি কমিউনিস্ট শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ করছেন।

আসল কথা, রামধন দাস তাঁর নাম আর বেশ বদলে ফেলে বিষ্ণুপ্রয়াগে আছেন এবং গুরুর উপদেশে সস্ত্রীক যোগ সাধনা করছেন। কেন তিনি সাহিত্যচর্চা আর বিপুল প্রতিপত্তি ত্যাগ করে আশ্রমবাসী তপস্বী হলেন তার রহস্য তাঁর মুখ থেকে কেবল একজন শুনেছেন—তাঁর গুরুদেবের প্রধান শিষ্য ও আশ্রম-সেক্রেটারি নিবিড়ানন্দ। এই নিবিড় মহারাজের পেটে কথা থাকে না। এঁর মুখ থেকে লোকপরম্পরায় যে খবর এখানে এসে পৌঁছেছে তাই

বিবৃত করছি। কিন্তু শুধু এই খবরটি শুনলে চলবে না, রামধন দাসের ইতিহাস গোড়া থেকে জানা দরকার।

বি. এ. পাস করার পর রামধন একজন বড় প্রকাশকের অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন। মনিবের ফরমাশে তিনি কতকগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যেমন ছেলেদের গীতা, ছোটদের বেদান্ত, কচিদের ভারতচন্দ্র, খোকাবাবুর গুপ্তকথা, খুকুমণির আত্মচরিত, ইত্যাদি। বইগুলি সস্তা সচিত্র আর প্রাইজ দেবার উপযুক্ত, সেজন্য কাটতি ভালই হল। একদিন রামধন এক বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে শুনলেন, গল্প রচনা খুব সোজা কাজ। সাহিত্যে কালো-বাজার নেই, কিন্তু চোরাবাজার অবারিত। বাঙালী লেখক ইংরিজী থেকে চুরি করে, হিন্দী লেখক বাংলা থেকে চুরি করে, এই হল দস্তুর। কথাটি রামধনের মনে লাগল। তিনি দেদার বিলিতী আর মার্কিন ডিটেকটিভ গল্প আত্মসাৎ করে বই লিখতে লাগলেন। খদ্দেরের অভাব হল না, তাঁর মনিবও তাঁকে লাভের মোটা অংশ দিলেন। কিন্তু রামধন দেখলেন, তাঁর রোজগার ক্রমশ বাড়লেও উচ্চ সমাজে তাঁর খ্যাতি হচ্ছে না। মোটর ড্রাইভার, কারিগর, টিকিট-বাবু, বকাট ছোকরা, আর অল্পশিক্ষিত চাকরিজীবীই তাঁর বইএর পাঠক। পত্রিকাওয়ালারা বিজ্ঞাপন ছাপেন কিন্তু সমালোচনা প্রকাশ করতে রাজী হন না। বলেন, এ হল নীচু দরের সাহিত্য, এর সমালোচনা ছাপলে পত্রিকার জাত যাবে। রামধন মনে মনে বললেন, বটে! আমার রোমাঞ্চ-লহরীকে হরিজন-সাহিত্য ঠাউরেছ? প্রেমের প্যাঁচ চাও, মনস্তত্ত্ব চাও, যৌন আবেদন চাও? আচ্ছা, আমার শক্তি শীঘ্রই দেখতে পাবে।

রামধন হুঁশিয়ার কর্মবীর, আগাগোড়া না ভেবে কোনও কাজে হাত দেন না। তিনি প্রথমেই মনে মনে পর্যালোচনা করলেন—বাংলা কথাসাহিত্যের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত কি রকম পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের লেখকদের হাত পা বাঁধা ছিল, প্রণয়ব্যাপার দেখাতে হলে প্রাচীন হিন্দুযুগে অথবা মোগল-রাজপুতের আমলে যেতে হত, নইলে নায়িকা জুটত না। তার পরের লেখকরা নোলক-পরা বালিকা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন, কিন্তু জুত করতে পারলেন না। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা নেহাত বাচ্চা, তবু বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সসম্মানে 'তিনি' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নাবালিকা সাবালিকা কোনও নায়িকাকেই খাতির করেন নি, কিন্তু তাঁর কমলা সুচরিতা ললিতা এখনকার দৃষ্টিতে খুকী মাত্র। পরে অবশ্য তিনি বয়স বাড়িয়েছেন, যেমন শেষের কবিতার লাবণ্য, চার অধ্যায়ের এলা। বাংলা গল্পের মধ্যযুগে জোরালো প্রেম দেখাতে হলে মামুলী নায়িকায় কাজ চলত না, শালী বউদিদি বা বিধবা উপনায়িকাকে আসরে নামাতে হত। সেকেলে গল্পের নায়কদেরও বৈচিত্র্য ছিল না, হয় প্রতাপের মতন যোদ্ধা, না হয় গোবিন্দলালের মতন ধনিসন্তান। দামোদর মুখুজ্যে ও তৎকালীন লেখকদের নায়করা প্রায় জমিদারপুত্র, তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, গরিব প্রজাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিত, এবং যথাকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খুশী করে রায়-বাহাদুর খেতাব পেত। তার পর ক্রমে ক্রমে বাঙালী সমাজের পটপরিবর্তন হল, সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও প্লটপরিবর্তন হল, বোমা স্বদেশী আর অসহযোগের সুযোগে মেয়ে-পুরুষের কাজের গণ্ডি বেড়ে গেল, মেলা-মেশা সহজ হল। অবশেষে এল কিষান-মজদুরের আহ্বান, কমরেডী কর্মক্ষেত্র, জাপানী আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নরহত্যা, দেশ-জবাই, স্বাধীনতা, বাস্তুত্যাগ, নারীহরণ, মহাকলিযুগ,

লোকলজ্জার লোপ, অবাধ দুষ্কর্ম। মানুষের দুর্দশা যতই বাড়ুক, গল্প লেখা যে খুব সুসাধ্য হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। এখনকার নায়ক কবি দোকানদার সৈনিক নাবিক বৈমানিক চোর ডাকাত দেশ-সেবক সবই হতে পারে। নায়িকাও নার্স টাইপিস্ট টেলিফোনবালা সিনেমাদেবী মজদুরনেত্রী সম্পাদিকা অধ্যাপিকা যা খুশি হতে পারে। সংস্কৃত কবিরা যাকে 'সংকেত' বলতেন, অর্থাৎ ট্রিস্ট, তারও বাধা নেই, রেস্তোরাঁ আছে, পার্ক আছে, লেক আছে, সিনেমা আছে। ভারতীয় কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ উপস্থিত হয়েছে, সমাজ আর পরিবেশ বদলে গেছে, অতএব রামধন একটু চেষ্টা করলেই শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য গল্পকারদের সমকক্ষ হতে পারবেন।

আধুনিক বাঙালী লেখকরা বুঝেছেন যে সেক্স অ্যাপীলই হচ্ছে উৎকৃষ্ট গল্পের প্রাণ। এই জিনিসটি আসলে আমাদের সনাতন আদিরস। কিন্তু তার ফরমুলা বড় বাঁধাধরা, বৈচিত্র্য নেই, ঝাঁজও মরে গেছে, সেজন্য আধুনিক রুচির উপযুক্ত অদলবদল করে তার নাম দেওয়া হয়েছে যৌন আবেদন। এপর্যন্ত কোনও বাঙালী সাহিত্যিক এই আবেদন পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন নি। ফরাসী লেখক ফ্লোবেয়ার প্রায় এক শ বছর আগে 'মাদাম বোভারি' লিখেছিলেন, কিন্তু এদেশের কোনও গল্পকার তার অনুকরণ করেন নি। লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি,' হাক্সলির 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' প্রভৃতির নকল করতে কারও সাহস হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কোনও নায়িকা 'প্রেমের বীর্যে যশস্বিনী' হতে পারে নি। চারু কমলা বিমলা আর বিনোদ বোঠানকে তিনি রসাতলের মুখে এনেও রাস টেনে সামলে রেখেছেন। আর শরৎ চাটুজ্যেই বা কি করেছেন? গুটিকতক ভ্রষ্টাকে সুশীলা বানিয়েছেন। দুর্দান্ত লম্পট জীবানন্দকে পোষ মানিয়েছেন, অথচ কোনও লম্পটাকে গৃহলক্ষ্মী

করতে পারেন নি। চারু বাঁড়ুজ্যে তাঁর 'পঙ্কতিলক'-এ এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা একবারে পণ্ড হয়েছে। আসল কথা, এদেশের কথাসাহিত্য এখনও সতীত্বের মোহ কাটাতে পারে নি।

পাশ্চাত্ত্য লেখকরা যা পেরেছেন রামধনও তা পারবেন, এ ভরসা তাঁর আছে। সমাজের মুখ চেয়ে লিখবেন না, তিনি যা লিখবেন সমাজ তাই শিখবে। রামধন তাঁর পদ্ধতি স্থির করে ফেললেন এবং বাছা বাছা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস মন্থন করে তা থেকে সার উদ্ধার করলেন। এই বিদেশী নবনীতের সঙ্গে দেশী শাক-ভাত আর লঙ্কা মিশিয়ে তিনি যে ভোজ্য রচনা করলেন তা বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব। প্রকাশক ভয়ে ভয়ে তা ছাপালেন। বইটি বেরুবামাত্র সাহিত্যের বাজারে হুলস্থূল পড়ে গেল।

প্রবীণ লেখক আর সমালোচকরা বজ্রাহত হয়ে বললেন, এ কি গল্প না খিস্তি? তাঁরা পুলিস অফিসে দূত পাঠালেন, মন্ত্রীদের ধরলেন যাতে বইখানা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু কিছুই হল না, কারণ কর্তারা তখন বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। প্রগতিবাদী নবীন সমাজ গল্পটিকে লুফে নিলেন। এই তো চাই, এই তো নবাগত যুগের বাণী, মিলনের সুসমাচার, প্রেমের মুক্তধারা, হৃদয়ের ঊর্ধ্বপাতন, আকাঙ্ক্ষার পরিতর্পণ। একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক—যিনি চুলে কলপ না দিয়ে মনে কলপ লাগিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টা করছেন—বললেন, বেড়ে লিখেছে রামধন। এতে দোষের কি আছে? তোমাদের ঋষিকল্প সবজান্তা লেখক এচ. জি. ওয়েল্‌স-এর নভেল 'বর্লাপিংটন অভ ব্লপ' পড়েছ? তাতে যদি কুরুচি না পাও তবে রামধনের বইএও পাবে না।

প্রথমে যে দু-চারটি বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছিল পরে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তোড়ে ভেসে গেল। বইটি কেনবার জন্য দোকানে

দোকানে যে কিউ হল তার কাছে সিনেমার কিউ কিছুই নয়। এক বৎসরের মধ্যে সাতটি সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। রামধন পরম উৎসাহে গল্পের পর গল্প লিখতে লাগলেন। যেসব সম্পাদক পূর্বে তাঁকে গাল দিয়েছিলেন তাঁরাই এখন গল্পের জন্য রামধনের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। সমস্ত সাহিত্যসভায় রামধনই এখন সভাপতি বা প্রধান অতিথি। তাঁর উপাধিও অনেক—সাহিত্যদিগ্‌গজ, গল্প-রাজচক্রবর্তী, উপন্যাসভাস্কর, কথারণ্যকেশরী, ইত্যাদি। তাঁর ভক্তের দল এক বিরাট সভায় প্রস্তাব করলেন যে তাঁকে জগত্তারিণী মেডাল দেওয়া হক। কিন্তু সস্তা নাইন ক্যারাট গোল্ডের তৈরী জানতে পেরে রামধন বললেন, ও আমার চাই না, বাহাত্তুরে বুড়োদের জন্যই ওটা থাকুক।

যাঁর লক্ষ টাকা জমেছে তিনি কোটিপতি হতে চান, যিনি এম. এল. সি. হয়েছেন তিনি মন্ত্রী হতে চান, সেকালে রায়বাহাদুররা সি. আই. ই. আর সার হবার জন্য লালায়িত হতেন। রামধনেরও উচ্চাশা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। তিনি স্থির করলেন এবারে এমন একটি উপন্যাস লিখবেন যার প্লট কোনও দেশের কোনও লেখক কল্পনাতেও আনতে পারেন নি। ভীরু বাঙালী লেখক কদাচিৎ নায়ককে উচ্ছৃঙ্খল করলেও নায়িকাকে একানুরক্তাই করে। তারা বোঝে না যে নারীরও জংলী জই অর্থাৎ ওআইল্ড ওট্‌স বোনা দরকার, নতুবা তার চরিত্র স্বাভাবিক হতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য লেখক অনেক গল্পে নায়িকাকে কিছুকাল স্বৈরিণী করে রাখেন, তাতে তার 'আবেদন' বেড়ে যায়। তার পর শেষ পরিচ্ছেদে তার বিয়ে দেন। কিন্তু এবারে রামধন দেশী বা বিদেশী কোনও গতানুগতিক পথে যাবেন না, একেবারে নতুন নায়িকা সৃষ্টি করবেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ভগবান নিজের মতলব অনুসারে নরনারীর চরিত্র

রচনা করেন। কিন্তু গল্পজগতে ভগবানের হাত নেই, রামধন নিজেই তাঁর পাত্র-পাত্রীর স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তিনি প্রচলিত সামাজিক আদর্শ মানবেন না, যেমন খুশি চরিত্র রচনা করবেন।

মা বাপ একসঙ্গে অনেক সন্তানকে ভালবাসে, তাতে দোষ হয় না। নারী যদি এককালে একাধিক পুরুষে আসক্ত হয় তাতেই বা দোষ হবে কেন? এখনকার প্রগতিবাদী লেখকদের তুলনায় ব্যাসদেব ঢের বেশী উদার ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে একসঙ্গে পাঁচটি পতি দিয়েছেন, যযাতির কন্যা মাধবীর এক পতি থাকতেই অন্য পতির সঙ্গে পর পর চার বার বিবাহ দিয়েছেন। নিজের জননী মৎস্য-গন্ধাকেও তিনি ছেড়ে দেন নি, তাঁকে শান্তনু-মহিষী বানিয়েছেন। ব্যাস বেপরোয়া বাহাদুর লেখক, কিন্তু রামধন তাঁকেও হারিয়ে দেবেন। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় পঞ্চপতি বরণ করেন নি, গুরুজনের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। মাধবী আর মৎস্যগন্ধাও নিজের মতে চলেন নি। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য কাকে বলে রামধন দাস তা এবারে দেখিয়ে দেবেন।

রামধন যে নতুন গল্পটি আরম্ভ করলেন তা খুব সংক্ষেপে বলছি। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান যেমন বৃন্দাবন, সিনেমার তারক-তারকার গগন যেমন টালিগঞ্জ, অভিজাত নায়ক-নায়িকার বিলাসক্ষেত্র তেমনি বালিগঞ্জ। আনাড়ী পাঠক—বিশেষত প্রবাসী আর পাড়াগেঁয়ে পাঠক—মনে করে বালিগঞ্জ হচ্ছে অলকাপুরী, যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সরার দেশ। সেখানে মশা আছে, মাছি আছে, পচা ড্রেন আছে, দারিদ্র্যও আছে, কিন্তু তার খবর কে রাখে। সেই কল্পলোক বালিগঞ্জেই রামধন তাঁর গল্পের ভিত্তিস্থাপন করলেন।

তিন একার জমির মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তাতে থাকেন প্রৌঢ় ব্যারিস্টার পি. পি. মল্লিক আর তাঁর রূপসী বিদুষী যুবতী কন্যা রম্ভা। বাড়িতে অন্য কোনও আত্মীয়ের জঞ্জাল নেই, অবশ্য দারোয়ান খানসামা বাবুর্চী যথেষ্ট আছে। মল্লিক সাহেব সকালে ব্রেকফাস্ট করেই তাঁর চেম্বারে যান, সেখান থেকে কোর্টে যান, ফিরে এসে বাড়িতে ঘণ্টা খানিক থেকেই ক্লাবে যান, তার পর অনেক রাত্রে টলতে টলতে ফিরে আসেন। কন্যার বিবাহের জন্য তাঁর কোনও চিন্তা নেই। বলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, বুদ্ধিও আছে, সম্পত্তিও ঢের পাবে; উপযুক্ত বর ও নিজেই বেছে নেবে।

বাড়ির তিন দিকে বাগান, এক দিকে গাছে ঘেরা সবুজ মাঠ। বিকেলে সেখানে নানা জাতের শৌখিন পুরুষের সমাগম হয়। তারা টেনিস খেলে, চা বা ককটেল খায়, তার পর রম্ভাকে ঘিরে আড্ডা দেয়। এরা সবাই তার প্রেমের উমেদার, কিন্তু এপর্যন্ত কেউ কোনও প্রশ্রয় পায় নি, রম্ভা সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেছে। পূর্বে অনেক মেয়েও এখানে আসত, কিন্তু পুরুষগুলোর একচোখোমির জন্য রেগে গিয়ে তারা আসা বন্ধ করেছে।

এই রকমে কিছুকাল কেটে গেল। যাদের ধৈর্য কম তারা একে একে আড্ডা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চেষ্টা করতে গেল। বাকী রইল শুধু আট জন পরম ভক্ত। সাড়ে সাত বলাই ঠিক, কারণ একজন হচ্ছে ইস্কুলের ছাত্র, এবারে ম্যাট্রিক দেবে। সে কথা বলে না, শুধু হাঁ করে রম্ভাকে দেখে আর বোকার মতন হাসে।

এই সাড়ে সাত জনের মধ্যে তিন জনের পরিচয় জানলেই চলবে, বাকী সব নগণ্য। প্রথম লোকটি ডকটর বিদ্যাপতি ঘোষ, বিস্তর ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরেছে, সরকারী ভাল চাকরি পেয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে ফ্লাইট-লেফটেনাণ্ট বিক্রম সিং রাঠোর,

লম্বা চওড়া জোয়ান, এয়ার ফোর্সে কাজ করে, এখন ছুটিতে আছে। তৃতীয় লোকটি শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায়, উড়িষ্যার কোনও রাজার জ্ঞাতি, অতি সুপুরুষ, সরাইকেলার নাচ জানে।

ক্রমশ সকলের সন্দেহ হল যে বিদ্যাপতি ঘোষের দিকেই রম্ভা বেশী ঝুঁকেছে। কিন্তু দু দিন পরেই দেখা গেল, নাঃ, ওই ষণ্ডামার্ক বিক্রম সিংটার ওপরেই রম্ভার টান। আরও দু দিন পরে বোধ হল, উহুঁ, ওই উড়িষ্যার নবকার্তিক শ্যামসুন্দরের প্রেমেই রম্ভা মজেছে।

কারও বুঝতে বাকী রইল না যে ওই তিন জনের মধ্যেই এক-জনকে রম্ভা বরমাল্য দেবে। অগত্যা আর সবাই আড্ডা থেকে ভেগে পড়ল, কিন্তু সেই ইস্কুলের ছেলেটি রয়ে গেল।

একদিন বিদ্যাপতি ঘোষ এক ঘণ্টা আগে এসে রম্ভাকে যথারীতি প্রণয়নিবেদন করলে। রম্ভা গদ্‌গদ স্বরে বললে, এর জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম, অনেকদিন থেকেই তোমাকে আমি ভালবাসি। তবে আজ আর বেশী কথা নয়, দশ দিন পরে তোমার কাছে আমার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করব।

পরদিন বিক্রম সিং রাঠোর এক ঘণ্টা আগে এসে বিবাহের প্রস্তাব করলে। রম্ভা বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার, তুমি আমার দিল কা পিয়ারা। লক্ষ্মীটি, ন দিন সময় দাও, তার পর পাকা কথা হবে।

তার পরদিন শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায় সকাল সকাল এসে বললে, শুন রম্ভা, তুমার জন্য আমি পাগল, তুমি আমার হও। রম্ভা উত্তর দিলে, আমিও তোমার জন্য পাগল, আট দিন সবুর কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকলে উপস্থিত হলে চা খাওয়ার পর সেই ম্যাট্রিক ছাত্রটিকে রম্ভা বললে, গাবলু, তুমি বাড়ি যাও। গাবলুর পৌরুষে ঘা লাগল। একটু রুখে বললে, কেন?

—দু দিন পরে পরীক্ষা তা মনে নেই? তুমি অঙ্কে বেজায় কাঁচা। যাও, বাড়ি গিয়ে গসাগু লসাগু কষ গে, এখানে ইয়ারকি দিতে হবে না।

গাবলু সকলের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল।

রম্ভা তার তিন প্রণয়ীকে বললে, এখন এখানে কোনও বাজে লোক নেই, আমার মনের কথা খোলসা করে বলছি শোন। তোমাদের তিন জনের সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছি, তিন জনই আমার বাঞ্ছিত বল্লভ, কান্ত দয়িত, দিলরুবা ডার্লিং।

বিদ্যাপতি হতভম্ব হয়ে বললে, তুমি পাগল হয়েছ নাকি? বিয়ে তো একজনের সঙ্গেই হতে পারে।

বিক্রম সিং বললে, মরদের অনেক জোরু হতে পারে, কিন্তু ঔরতের এক শৌহর। এই হল আইন। তুমি আমাদের মধ্যে এক-জনকে বেছে নাও, নয় তো ভারী গড়বড় হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, রম্ভা, তুমি এ কি বলছ? ছি ছি, হে জগন্নাথ দীনবন্ধু!

রম্ভা উত্তর দিলে, আমি সত্য বলেছি, আমার কথার নড়চড় হবে না। শোন বিদ্যাপতি, তুমি আমার দেশের লোক, বিদ্যার জাহাজ, তোমাকে আমার চাইই। আর বিক্রম সিং, রাজপুত জাতটির ওপর আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা টান আছে। তোমার মতন নওজওআন বীরকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। আর শ্যাম-সুন্দর, তুমি ললাটেন্দুকেশরীর বংশধর, তোমরা চিরকাল সৌন্দর্যের উপাসক, তুমি নিজেও পরম সুন্দর। তোমাকে না হলে আমার চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তবে আর এদিক ওদিক করছ কেন রম্ভা? তুমি রাধা আমি শ্যাম, আমাকে বিয়া কর।

রম্ভা বললে, রাধার সঙ্গে শ্যামের বিয়ে হয় নি।

বিদ্যাপতি বললে, রম্ভা, তুমি স্পষ্ট করে বল তো কাকে বিয়ে করতে চাও।

—কাকেও নয়। বিবাহের কোনও দরকার নেই, তোমরা তিন জনেই মিলে মিশে আমার কাছে থাকবে। যদি নিতান্ত না বনে তবে নিজের নিজের বাড়িতেই থেকো, ডেট ফিক্‌স করে আমার কাছে আসবে।

—সমাজের ভয় কর না?

—আমরা নতুন সমাজ গড়ব। আবার বলছি শোন। তোমাদের তিন জনকেই আমি ভালবাসি। বিনা বিবাহে একসঙ্গে বা পালা করে যদি আমার সঙ্গে বাস কর তবে আমি ধন্য হব, তোমরাও নিশ্চয় সুখী হতে পারবে। তাতে যদি রাজী না হও তবে চিরবিদায়, আমি তিব্বতে চলে যাব। আমার আদর্শ বিসর্জন দিতে পারব না।

বিদ্যাপতি বললে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ঘর করতে পারে, কিন্তু পুরুষ সপতি বরদাস্ত করবে না, খুনোখুনি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, সে ভারী মুশকিলের কথা। আমরা মরে গেলে তুমি কার সঙ্গে ঘর করবে রম্ভা?

রম্ভা বললে, আমার আর একটু বলবার আছে শোন। তোমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর, বেশ করে ভেবে দেখ, সেকেলে সংস্কারের বশে আমার এই মহৎ সামাজিক এক্সপেরিমেণ্টটি পণ্ড করে দিও না। দশ দিন পরে তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানিও, তার মধ্যে এখানে আর এসো না, তাতে শুধু বাজে তর্ক আর কথা কাটাকাটি হবে। এই আমার শেষ কথা।

তিন প্রণয়ী সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে গেল।

এই পর্যন্ত লেখার পর রামধন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গল্পের প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস সমস্তই বাকী। এর পরেই পট জমে উঠবে, পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক জটিলতর হবে, রামধন ভানুমতীর খেল দেখাবেন। তিনি তাঁর চমৎকার প্লটটির সমাধান মামুলী উপায়ে কিছুতেই হতে দেবেন না। দু জন নায়ককে মেরে ফেলে লাইন ক্লিয়ার করা অতি সহজ, কিন্তু তাতে বাহাদুরি কিছুই নেই। নায়িকাকেও তিনি মারবেন না অথবা দেশের কাজে বা ধর্মকর্মে তার জীবন উৎসর্গ করবেন না। রামধন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে রম্ভার পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত করবেনই। কিন্তু শুধু তিন নায়কের একমুখী প্রেম এবং এক নায়িকার ত্রিমুখী প্রেম দেখালেই চলবে না, অন্য নরনারীর সঙ্গেও তাদের প্রেমলীলা দেখাতে হবে, তবেই তাঁর গল্পটি একেবারে অভাবিতপূর্ব বৈচিত্র্যময় রসঘন চমকপ্রদ হবে। প্রথম ধাক্কায় ঘাবড়ে গেলেও সমঝদার পাঠকরা পরে ধন্য ধন্য করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন নায়কের সঙ্গে এক নায়িকার মিলন ঠিক কি ভাবে দেখাবেন, তাদের যৌথ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কি রকম করবেন, সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ভাবে বজায় থাকবে—এই রকম নানা সমস্যা তাঁর মনে উঠতে লাগল। রামধন দমবার পাত্র নন। এতটা যখন গড়তে পেরেছেন তখন শেষটাই বা না পারবেন কেন। তাড়াতাড়ি করা ঠিক হবে না, তিনি দিনকতক লেখা বন্ধ রেখে বিশ্রাম নেবেন। তার মধ্যে সমাধানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নিশ্চয় তাঁর মাথায় এসে পড়বে।

রামধন কলকাতা ছেড়ে কোন্নগরে গঙ্গার ধারে তাঁর এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিশ্রাম ঠিক নয়, এক-

রকম তপস্যা। তিনি তাঁর মনের বল্‌গা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর কল্পনা এলোমেলো নানা পথে সমস্যার সমাধান খুঁজছে।

রাত বারোটা, রামধন বিছানায় শুয়ে সশব্দে ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নাক ডাকা থেমে গেল। জাগা আর ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থায় তিনি মশারির ভিতর থেকে দেখলেন, তিনটে ছায়ামূর্তি। মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে উঠল। রামধন তাদের চিনতে পারলেন, তাঁরই গল্পের তিন নায়ক। তারা একটা গোল টেবিল বৈঠকে বসে তর্ক করছে।

বিদ্যাপতি বলছে, এই যে বিশ্রী বিপরিস্থিতি, এ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় তো আমার মাথায় আসছে না।

বিক্রম সিং উত্তর দিলে, উপায় আছে। ডুয়েল লড়লে সহজেই ফয়সালা হতে পারবে। এই ধর, প্রথমে তোমার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের লড়াই হল, তুমি মরে গেলে। তার পর শ্যাম আর আমার লড়াই হল, শ্যাম মরল। তখন আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না, আমার সঙ্গে রম্ভার শাদি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, তুমার মুণ্ড হবে, মানুষ খুন করার জন্য তুমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তা ছাড়া এখন হচ্ছে গান্ধীরাজ, খুন জখম চলবে না। আমি বলি কি—লটারি লাগাও।

বিদ্যাপতি বললে, রম্ভা তাতে রাজী হবে না, ভারী বেয়াড়া মেয়ে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

এমন সময় রম্ভা হঠাৎ এসে বললে, তোমরা কি স্থির করলে? তিন জনে একমত হয়েছ তো?

শ্যামসুন্দর বললে, হাঁ, তুমার নাক কাটি দিব। তুমাকে চাই না,

আমার দু-গোটা ভাল ভাল বহু দেশে আছে, বিক্রম সিংএর ভি ওমদা ওমদা জোরু আছে। আর বিদ্যাপতিবাবুর বহু তো মজুত রয়েছে, উনি ইচ্ছা করলেই তেলেনা সরকারকে বিয়া করতে পারেন।

নায়কদের এই বিদ্রোহ দেখে রামধন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। শুয়ে থেকেই হাত নেড়ে বললেন, না না, ওসব চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তু কোন্ রে শড়া? তুই কে?

রামধন উত্তর দিলেন, আমিই গল্পলেখক, তোমাদের স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তোমরা নিজের মতলবে চলতে পার না, আমি যেমন চালাব তেমনি চলবে। আমার মাথা থেকেই তোমরা বেরিয়েছ।

বিক্রম সিং বললে, এই ছুছুন্দরটা বলে কি? এই আমাদের পয়দা করেছে? আমাদের বাপ দাদা পরদাদা নেই?

রম্ভা বললে, কেউ নেই, কেউ নেই, আমরা সব ঝুটো।

বিক্রম সিং একটানে খাটের ছতরি খুলে ফেলে একটা কাঠ হাতে নিয়ে রামধনকে বললে, এই, আমরা সব ঝুটা?

রামধন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, তা এরকম ঝুটা বই কি—যখন আমারই কল্পনাপ্রসূত আপনারা।

—তুই সচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে আমি তো ঝুটা হতে পারি না।

—এই ডান্ডা সচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে এও ঝুটা নয়।

অনন্তর তিন নায়ক আর এক নায়িকা ছতরির কাঠ দিয়ে বেচারা রামধনকে পিটতে লাগল। স্বামীর আর্তনাদ শুনে রামধন-পত্নী ননীবালার ঘুম ভেঙে গেল, তিনি একটি চিৎকার ছেড়ে মূর্ছিত হলেন। তার পর চার মূর্তি তান্ডব নাচতে নাচতে অদৃশ্য হল।

রামধন বেশী জখম হন নি। একটু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে কোনও রকমে বিছানা থেকে উঠলেন এবং ননীবালার মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে তাঁকে চাঙ্গা করলেন।

ননীবালা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, গেছে?

—গেছে।

—ডাকাত?

—ডাকাত নয়।

—সাহিত্যিক গুণ্ডা?

—তাও নয়। বেতাল জান? নিরাশ্রয় প্রেত মরা মানুষের দেহে ভর করলে বেতাল হয়। শুনেছি, যদি পছন্দ মতন লাশ না পায় তবে তারা গল্পের খাতায় ঢুকে গিয়ে নায়ক-নায়িকার ওপর ভর করে। এ তাদেরই কাজ।

—তোমার ওপর ওদের রাগ কেন?

—বোধ হয় সেকেলে প্রেতাত্মা, আমার প্লটের রসগ্রহণ করতে পারে নি।

—তুমি আর ছাই ভস্ম লিখো না বাপু।

—রাম বল, আবার লিখব! দেখছ না, আমার সমস্ত খাতা কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে, দামী ফাউনটেন পেনটা চিবিয়ে নষ্ট করেছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে দিয়েছে। তোমার দিদিমার গুরুদেব বিষ্ণুপ্রয়াগে থাকেন না? তাঁর আশ্রমেই বাস করব ভাবছি। ভোরের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাই চল, তার পর দিন দুইএর মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে চুপি চুপি বিষ্ণুপ্রয়াগ রওনা হব।

১৩৫৮

ভরতের ঝুমঝুমি

হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গার ধারে যে ধর্মশালা আছে তারই সামনের বড় ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছি—আমি, আমার মামাতো ভাই পুলিন, আর তার দশ বছরের ছেলে পল্টু। তা ছাড়া টহলরাম চাকর আর চারটে সাদা ইঁদুরও আছে। ইঁদুর আনতে আমাদের খুব আপত্তি ছিল, কিন্তু পল্টু বললে, বা রে, আমি সঙ্গে না নিলে এদের খাওয়াবে কে? বাড়ির ছটা বেরালই তো এদের খেয়ে ফেলবে। যুক্তি অকাট্য, ইঁদুরের ভাড়াও লাগে না, সুতরাং সঙ্গে আনা হয়েছে। তারা রাত্রে একটা খাঁচার মতন বাক্সে বাস করে, দিনের বেলায় পল্টুর পকেটে বা মুঠোর মধ্যে থাকে, অথবা তার গায়ের ওপর চরে বেড়ায়।

সমস্ত সকাল টো টো করে বেড়িয়েছি, এখন বেলা এগারটা, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। চা তৈরির সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে এনেছি, কিন্তু রান্নার কোনও যোগাড় নেই, তার হাঙ্গামা আমাদের পোষায় না। দোকান থেকে এক ঝুড়ি মোটা মোটা আটার লুচি, খানিকটা স্বচ্ছন্দ-বনজাত কচুঘেঁচুর ঘণ্ট, আর সের খানিক নুড়ির মতন শক্ত পেড়া আনানো হয়েছে। আমরা স্নান সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাটিয়ায় বসে কোলের ওপর শালপাতা বিছিয়েছি, টহলরাম পরিবেশনের উপক্রম করছে, এমন সময় বাইরে থেকে ভাঙা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল—অয়মহং ভোঃ!

কথাটা কোথায় যেন আগে শুনেছি। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলুম, একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা। রংটা বোধ হয় এককালে ফরসা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট

কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া, যেন ছাগলে খেয়েছে। কিন্তু থুতনির দাড়ি বেশ ঘন আর লম্বা, নীচের দিকে ঝুঁটির মতন একটি বড় গেরো বাঁধা। দেখলে মনে হয় এই গেরোটি কোনও কালে খোলা হয় না। পরনের গেরুয়া কাপড় আর কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা। সর্বাঙ্গে ধুলো, গলায় তেলচিটে পইতে, হাতে একটা ঝুলি আর তোবড়া ঘটি। রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মের প্রলেপ, গাঁজার কলকে, চিমটে, কমণ্ডলু প্রভৃতি মামুলী সাধুসজ্জা কিছুই নেই।

প্রশ্ন করলুম, ক্যা মাংতা বাবাজী? বাবাজী উত্তর দিলেন না, সোজা ঘরে ঢুকে আমার খাটিয়ায় বসে পড়লেন। টহলরাম বাঙালীর সংসর্গে থেকে একটু নাস্তিক হয়ে পড়েছে, অচেনা সাধুবাবাদের ওপর তেমন ভক্তি নেই। রুখে উঠে বললে, আরে কৈসা বেহুদা আদমী তুম, উঠো খাটিয়াসে!

সাধুবাবা ভ্রূকুটি করে রাষ্ট্রভাষায় যে গালাগালি দিলেন তা অশ্রাব্য অবাচ্য অলেখ্য। পুলিন অত্যন্ত রেগে গিয়ে গলাধাক্কা দিতে গেল। আমি তাকে জোর করে থামিয়ে বললুম, কর কি, বাবাজীর সঙ্গে একটু আলাপ করেই দেখা যাক না।

প্রমোদ চাটুজ্যে মশাই বিস্তর সাধুসঙ্গ করেছেন। সাধুচরিত্র তাঁর ভাল রকম জানা আছে, যোগী অবধূত বামাচারী তান্ত্রিক অঘোরপন্থী প্রভৃতি হরেক রকম সাধক সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে এইটুকু বুঝেছি যে গরুর যেমন শিং, শজারুর যেমন কাঁটা, খট্টাশের যেমন গন্ধ, তেমনি সিদ্ধপুরুষদের আত্মরক্ষার উপায় গালাগালি। তাঁদের কটুবাক্যের চোটে অনধিকারী বাজে ভক্তরা ভেগে পড়ে, শুধু নাছোড়বান্দা খাঁটী মুক্তিকামীরা রয়ে যায়। এই আগন্তুক সাধুবাবাটির মুখখিস্তির বহর দেখে মনে হল

নিশ্চয় এ'র মধ্যে বস্তু আছে। সবিনয়ে বললুম, ক্যা মাংতে হুকুম কিজিয়ে বাবা।

বাবা বললেন, ভোজন মাংতা। আরে তোমরা তো দেখছি বাঙালী, বাংলাতেই বল না ছাই।

বাবাজীর মুখে আমাদের মাতৃভাষা শুনে খুশী হয়ে বললুম, এই পুরি তরকারি পেড়া আপনার চলবে কি?

—খুব চলবে। কিন্তু ওইটুকুতে কি হবে। আমি আছি, তোমরা তিন জন আছ, আর তোমাদের ওই রাক্ষস চাকরটা আছে। আরও সের দুই আনাও।

টহলরামকে আবার বাজারে পাঠালুম। পুলিনের পেশা ওকালতি, কিন্তু মক্কেল তেমন জোটে না, তাই বেচারা সুবিধে পেলেই যাকে তাকে সওয়াল করে শখ মিটিয়ে নেয়। বললে, আপনি বাঙালী ব্রাহ্মণ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি? আমার ভাষা সংস্কৃত, তবে তোমরা তা বুঝবে না তাই বাংলা বলছি।

—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, গিরি পুরী ভারতী অরণ্য না আর কিছু?

—ওসব অর্বাচীন দলের মধ্যে আমি নেই। আমার আদি আশ্রম ব্রহ্মলোক, আমি একজন ব্রহ্মর্ষি।

—নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—বোবা যখন নও তখন না পারবে কেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবে কি? তোমরা তো পাষণ্ড নাস্তিক। আমি হচ্ছি মহামুনি দুর্বাসা।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর প্রণিপাত করে আমি বললুম, ধন্য আমরা! চেহারা যেমনটি শুনেছি তেমনটি দেখছি বটে, কিন্তু লোকে যে আপনাকে অত্যন্ত বদরাগী বলে তা তো মনে হচ্ছে না। এই তো আমাদের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন হয়ে কথা বলছেন।

—বদরাগী কেন হব। তবে এককালে আমার তেজ খুব বেশী ছিল বটে। কিন্তু সেই বজ্জাত মাগীটা আমার দফা সেরেছে।

হাত জোড় করে বললুম, তপোধন, যদি গোপনীয় না হয় তবে কৃপা করে এই অধমদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আপনি তো সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লোক, এই ঘোর কলিযুগে আমাদের মতন পাপীদের কাছে এলেন কি করে?

—পিতা অত্রি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, বৎস, তুমি হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গাতীরবর্তী ধর্মশালায় যাও, সেখানে তোমার সংকটমোচন হবে।

—আপনার আবার সংকট কি প্রভু? আপনিই তো লোককে সংকটে ফেলেন।

—সব বলব, কিন্তু আগে ভোজন সমাপ্ত হক। তোমরাও খেয়ে নাও।

পুলিন বললে, আপনি স্নান করবেন না?

—সে তো কোন্ কালে সেরেছি, ব্রাহ্ম মুহূর্তেই গঙ্গায় একটি ডুব দিয়েছি।

—কিন্তু জটায় আর দাড়িতে যে বড্ড ময়লা লেগে রয়েছে প্রভু, একটু সাবান ঘষলে হত না? গায়েও দেখছি ছারপোকা বিচরণ করছে। যদি অনুমতি দেন তো একটু ডিডিটি স্প্রে করে দিই। আমাদের সঙ্গেই আছে।

—খবরদার, ওসব করতে যেয়ো না। গুটিকতক অসহায় প্রাণী

যদি আমার গায়ে বস্ত্রে আর জটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তো থাকুক না। তুমি তাদের তাড়াবার কে?

টহলরাম খাবার নিয়ে এল। মহামুনি দুর্বাসার আদেশে আমরা তাঁর সঙ্গেই খাটিয়ায় বসে ভোজন করলুম। ভোজনান্তে আমি সিগারেটের টিনটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, প্রভু, এ জিনিস চলবে কি? এর চেয়ে উঁচুদরের ধূমোৎপাদক বস্তু তো আমাদের নেই।

একটি সিগারেট তুলে নিয়ে দুর্বাসা বললেন, এতেই হবে। গঞ্জিকা আমার সয় না, বাতিক বৃদ্ধি হয়। কই, তোমরা ধূমপান করবে না?

লজ্জায় জিব কেটে বললুম, হেঁ হেঁ, আপনার সামনে কি তা পারি?

—ভণ্ডামি ক'রো না। আমার সামনে একরাশ লুচি গিলতে বাধল না, আর যত লজ্জা ধোঁয়ায়! নাও নাও, টানতে আরম্ভ কর।

অগত্যা পুলিন আর আমিও সিগারেট ধরালুম। শোনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি দেখে দুর্বাসা তাঁর ইতিহাস আরম্ভ করলেন।

শকুন্তলার কথা জান তো? কালিদাস তার নাটকে লিখেছে। মেয়েটা আমার ডাকে সাড়া দেয় নি তাই হঠাৎ রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছিলুম—তুমি যার কথা ভাবছ সে তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। শকুন্তলা এমনি বেহুঁশ যে আমার কোনও কথাই তার কানে গেল না। কিন্তু তার এক সখী শুনতে পেয়েছিল। সে আমার কাছে এসে পায়ে ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করলে। তার নাম অনসূয়া। আমার মায়েরও ওই নাম, তাই প্রসন্ন হয়ে অভিশাপ

খুব হালকা করে দিলুম। কিন্তু সখীটা অতি কুটিলা, শকুন্তলার মা মেনকার কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাল।

এই ঘটনার পর প্রায় দশ মাস কেটে গেল। তখন আমি শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গোত্তরীর নিকট বাস করছি। একদিন প্রাতঃকালে ভাগীরথী-তীরে বসে আছি এমন সময় একজন শিষ্য এসে জানালে, একটি অপূর্ব রূপবতী নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। বিরক্ত হয়ে বললুম, আঃ জালাতন করলে, এখানেও রূপবতী নারী! নির্জনে একটু পরমার্থচিন্তা করব তারও ব্যাঘাত। কে এসেছে পাঠিয়ে দাও এখানে।

দেখেই চিনলুম মেনকা অপ্সরা। ভব্যতার জ্ঞান নেই, দাঁতন চিবুতে চিবুতে এসেছে, বোধ হয় ভেবেছে তাতে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠে বললুম, কিজন্য আসা হয়েছে এখানে? জান, আমি মহাতেজস্বী দুর্বাসা মুনি, বিশ্বামিত্রের মতন হ্যাংলা পাও নি যে লাস্য হাস্য ছলা কলা হাব ভাব ঠসক ঠমক দেখিয়ে আমাকে ভোলাবে।

মেনকা ভেংচি কেটে বললে, আ মরি মরি! জগতে তো আর কেউ নেই যে তোমাকে ভোলাতে আসব! তোমার ভালর জন্যই দেখা কবতে এসেছি। তা যদি না চাও তো চললুম, কিন্তু এর পরে বিপদে পড়লে দোষ দিতে পাবে না। এই বলে মেনকা এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।

মাগীর আস্পর্ধা কম নয়, আমাকে তুমি বলছে। শাপ দিতে যাচ্ছিলুম—তুই এক্ষুনি শুঁয়োপোকা হয়ে যা। কিন্তু ভাবলুম, উঁহু, ব্যাপারটা আগে জানা দরকার। বললুম, কিজন্য এসেছ বলই না ছাই।

মেনকা বললে, মহাদেব যে তোমার ওপর রেগে আগুন হয়েছেন,

শকুন্তলাকে তুমি বিনা দোষে শাপ দিয়েছিলে শুনে। আর একটু হলেই তোমাকে ভস্ম করে ফেলতেন, নেহাত আমি পায়ে ধরে বোঝালুম তাই এবারকার মতন তুমি বেঁচে গেছ।

আমি দেবতা মানুষ কাকেও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু মহাদেবকে ডরাই। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বললে তুমি তাঁকে?

—বললুম, আহা নির্বোধ ব্রাহ্মণ, মাথার দোষও আছে, না বুঝে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে ফেলেছে। তা শকুন্তলা তো বেশী দিন কষ্ট পাবে না, আপনি দুর্বাসা মুনিকে এবারটি ক্ষমা করুন। মহাদেব আমাকে স্নেহ করেন, তাঁর শাশুড়ীর নাম আব আমাব নাম একই কি না। বললেন, বেশ, ক্ষমা করব, কিন্তু আগে তুমি তাকে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাও।

—কি প্রায়শ্চিত্ত করাবে শুনি?

—তোমার ভয় নেই ঠাকুব, খুব সোজা প্রায়শ্চিত্ত। শকুন্তলা এখন হেমকূট পর্বতে প্রজাপতি কশ্যপেব আশ্রমে আছে। আমি খবর পেয়েছি সম্প্রতি তাব একটি খোকা হয়েছে। কশ্যপ বলেছেন, এই ছেলে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হবে এবং পৃথিবী শাসন করবে। মনে করেছিলুম গিয়ে একবার দেখে আসব, কিন্তু তা আর হল না। ইন্দ্র সব অপ্সরাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁব ব্যাটা জয়ন্ত বিগড়ে যাচ্ছে—হবে না কেন, বাপের ধাত পেয়েছে—তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিচ্ছেন। দু মাস ধরে অষ্ট প্রহব নৃত্য গীত পান ভোজন চলবে। আজই আমাকে যেতে হবে। দেবতাদের ষাট দিনে মানুষের ষাট বৎসর। আমি যখন ফিরে আসব তখন শকুন্তলার ছেলে বুড়ো হয়ে যাবে। তাই তোমাকেই তার কাছে পাঠাতে চাই।

আমি ভাবলুম, এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি যদি শকুন্তলার কাছে গিয়ে তাকে আর তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে

আসি তবে দেখতে শুনতে ভালই হবে। মেনকাকে বললুম, আমি যেতে রাজী আছি, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা কি, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে?

—একটি কাজের ভার নিয়ে তোমাকে যেতে হবে। এই ঝুমঝুমিটি খোকার হাতে দেবে আর আমার হয়ে তাকে একটু আদর করবে। কিন্তু তুমি বড় নোংরা, আগে ভাল করে হাত ধোবে, তার পর খোকার থুতনিতে ঠেকিয়ে আলগোছে একটি চুমু খাবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, সে আবার কি রকম?

—এই রকম আর কি। এই বলে মেনকা তার হাত আমার দাড়িতে ঠেকিয়ে মুখের কাছে এনে একটা শব্দ করলে,—চুঃ কি থুঃ বুঝতে পারলুম না। তার পর বললে, এই নাও ঝুমঝুমি। খবরদার, হারিও না যেন, তা হলে মজা টের পাবে।

ঝুমঝুমিটা নিয়ে আমি বললুম, হারাব কেন, খুব সাবধানে রাখব। আহা, তুমি তোমার নাতিটিকে দেখতে পাবে না, বড় দুঃখের কথা। দেখ মেনকা, তুমি তো চলে যাচ্ছ, যদি আমার কাছে কোনও বর চাইবার থাকে তো এই বেলা বল।

—নাঃ, বর টর আমার দরকার নেই।

আমি বললুম, নেই কেন? যদি চাও তো আমার ঔরসে তোমার গর্ভে একটি পুত্র দিতে পারি। যদি তিন-চারটি বা শ-খানিক চাও তাও দিতে পারি।

নাক সিটকে মেনকা উত্তর দিলে, হয়েছে আর কি! তুমি নিজেকে কি মনে কর, কার্তিক না কন্দর্প? তোমার সন্তান তো রূপে গুণে একেবারে বোকা পাঁঠা হবে।

অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে আমি বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, বর না চাও তো আমার বড় বয়েই গেল। আমি অপাত্রে দান করি না।

বেশ, এখন তুমি বিদেয় হও, একটা শুভদিন দেখে আমি শকুন্তলার কাছে যাব।

পুলিন জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু, মেনকার বয়স কত?

দুর্বাসা বললেন, তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি। অপ্সরার আবার বয়স কি? জ্যোৎস্না বিদ্যুৎ রামধনু—এসবের বয়স আছে নাকি? তার পর শোন। মেনকা চলে গেল। তিন দিন পরে আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। অপ্সরাই বল আর দিব্যাঙ্গনাই বল, মেনকা আসলে হল স্বর্গবেশ্যা, লৌকিকতার কোনও জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্যবোধ আছে। শুধু ঝুমঝুমি নিয়ে গেলে ভাল দেখাবে কেন, কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেই হবে। সেজন্য আশ্রমের নিকটস্থ বন থেকে একটি সুপুষ্ট ওল আর সের-খানিক বড় বড় তিন্তিড়ী সংগ্রহ করে ঝুলির ভেতর নিলুম।

পুলিন বললে, এক মাসের খোকা বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল খাবে?

আমি বললুম, তা আর না খাবে কেন। সেকালের ক্ষত্রিয় খোকারা পাথর হজম করত, বিলিতী গুঁড়ো দুধের তোয়াক্কা রাখত না।

দুর্বাসা বললেন, তোমরা অত্যন্ত মূর্খ। ওল আর তেঁতুল ছেলে কেন খাবে, আশ্রমবাসী তপস্বী আর তপস্বিনীরা সবাই খাবেন। তার পর শোন। যথাকালে হেমকূটে পৌঁছে মরীচিপুত্র ভগবান কশ্যপ ও তৎপত্নী ভগবতী অদিতিকে বন্দনা করলুম, তার পর শকুন্তলার কাছে গেলুম। আমি যে শাপ দিয়েছিলুম তা বোধ হয় সে জানত না, আমাকে দেখে খুশীই হল। ওল আর তেঁতুল উপহার দিলুম, মেনকার কথামত ছেলেকে আদর করে আশীর্বাদও করলুম। বললুম, শকুন্তলা, তোমার এই পুত্র শ্রীমান সর্বদমন-ভরত আসমুদ্র-

হিমাচল সমস্ত দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী হবে। এর প্রজারা যে ভূখণ্ডে থাকবে তার নাম হবে ভারতবর্ষ,—বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ। তুমিও অচিরে পতির সহিত মিলিত হবে। তার পর ট্যাঁক থেকে ঝুমঝুমি বার করতে গিয়েই চক্ষুস্থির।

আমি বললুম, বলেন কি, ঝুমঝুমি পেলেন না?

—মোটেই না। আমার পরনের কাপড় উত্তরীয় কম্বল সব ঝাড়লুম, ঝুলি ঘটি মায় জটা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। শকুন্তলার মুখটি কাঁদোকাঁদো হল, আহা, তার মায়ের দেওয়া উপহারটি হারিয়ে গেল! মেনকা যতই নচ্ছার হক, নিজের মা তো বটে। আমি বললুম, দুঃখ ক'রো না শকুন্তলা, আরও ভাল ঝুমঝুমি এনে দেব।

দুজন বুড়ী তপস্বিনী শকুন্তলার কাছে ছিল। একজন বললে, পাগলের মতন যা তা ব'লো না ঠাকুর। ছেলের দিদিমার দেওয়া যৌতুক আর তোমার ছাইপাঁশ কি সমান? তুমি ভারী অলবড্যে মুনি। নিশ্চয় নাইবার সময় তোমার ট্যাঁক থেকে জলে পড়ে গেছে আর মাছে কপ করে গিলেছে। যাও, এখন রাজ্যের রুই-কাতলা ধরে ধরে পেট চিরে দেখ গে।

অন্য বুড়ীটা বললে, কি বলছ গা দিদি! শুধু রুইকাতলা কেন, মিরগেল চিতল বোয়াল কালবোস শোল শাল চাঁই ঢাঁই এসব মাছের পেটেও তো থাকতে পারে।

পুলিন বললে, কচ্ছপের পেটেও যেতে পারে।

আমি বললুম, হাঙর কুমির শুশুক সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তীর পেটে যেতেও বাধা নেই।

দুর্বাসা আমাদের দিকে একবার কটমট করে চাইলেন, তার পর বলে যেতে লাগলেন।—

আমি আর দাঁড়ালুম না, কথাটি না বলে পালিয়ে এলুম। যে পথে এসেছিলুম সেই পথের সর্বত্র খুঁজে দেখলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। আমি অত্যন্ত ভুলো লোক, কিন্তু ঝুমঝুমিটা তো ট্যাঁকেই গোঁজা ছিল। নিশ্চয় নাইবার সময় জলে পড়ে গেছে। যেখানে যেখানে স্নান করেছিলুম সর্বত্র জলে নেমে হাতড়ে দেখলুম, কিন্তু পাওয়া গেল না। তবে বোধ হয় রুই মাছেই গিলেছে, শকুন্তলার আংটির মতন। বোয়াল কালবোস চাঁই ঢাঁইও হতে পারে। জেলেদের ডেকে ডেকে বললুম, ওরে, মাছের পেটে ঝুমঝুমি পেয়েছিস? বার করে দে, আশীর্বাদ করব। ব্যাটারা বললে, মাছের পেটে ঝুমঝুমি থাকে না ঠাকুর, পটকা থাকে। এই বলে দাঁত বার করে হাসতে লাগল। আমি অভিশাপ দিলুম, তোরা দে'তো কুমির হয়ে যা। কিন্তু কোনও ফল হল না।

ওঃ, মেনকার কথা রাখতে গিয়ে কি সংকটেই পড়েছি! ঝুমঝুমি তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা যে মহাপাপ। তার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, অসংখ্য বার অসংখ্য স্থানে খুঁজেছি, কিন্তু ঝুমঝুমি পাই নি। আমার আর শান্তি নেই, ব্রহ্মতেজ নেই, অভিশাপ দিলে ফলে না, আমি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছি। শিষ্যরা আমাকে ত্যাগ করেছে, আমি এখন ছন্নছাড়া হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি বললুম, মহামুনি, শান্ত হ'ন, আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। ভরত রাজা তো কবে স্বর্গলাভ করেছেন, তাঁর আর ঝুমঝুমির দরকার কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তপস্যা করুন, যোগ-সাধনা করুন, হরিনাম করুন। অথবা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জীবন-স্মৃতি লিখুন, জটাশ্মশ্রুধারী উগ্রতপা মুনি-ঋষিদের সঙ্গে গ্ল্যামার গার্ল অপ্সরাদের মোলাকাত বিবৃত করুন, পত্রিকাওয়ালারা তা

নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। ঝুমঝুমির কথা একেবারে ভুলে যান।

—হায় হায়, ভোলবার জো কি! ওই ঝুমঝুমিই হচ্ছে মেনকার অভিশাপ, শকুন্তলার প্রতিশোধ। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যখন তখন ঝুমঝুম শব্দ শুনি।

দুর্বাসা হঠাৎ চিৎকার করে হাত পা ছুড়ে নাচতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের ছেলে পল্টু তাঁর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল—মেরে ফেললে রে, সব কটাকে মেবে ফেললে!

ব্যাপার গুরুতর। পল্টু নিবিষ্ট হয়ে ঝুমঝুমির ইতিহাস শুনছিল সেই অবকাশে ইঁদুরগুলো তার পকেট থেকে বেরিয়ে দুর্বাসাকে আক্রমণ করেছে। দুটো তাঁর কাঁধে উঠেছে, একটা অধোবাসে ঢুকে গেছে, আর একটা কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর নাচের ঝাঁকুনিতে তিনটে ইঁদুর নীচে পড়ে গেল। পল্টু কোনও রকমে সেগুলোকে দুর্বাসার পদাঘাত থেকে রক্ষা করলে।

দুর্বাসা বললেন, তুই অতি দুর্বিনীত বালক।

পুলিন বললে, টেক কেয়ার তপোধন, আমার ছেলেকে যদি শাপ দেন তো ভাল হবে না বলছি।

দুর্বাসা বললেন, ইঁদুর পোষা মহাপাপ, চণ্ডালেও পোষে না।

পল্টু রেগে গিয়ে বললে, বা রে, আপনি যে নিজের গায়ে ছারপোকা পোষেন তা বুঝি খুব ভাল? দেখ না বাবা, ঋষি মশায়ের গা থেকে কত ছারপোকা আমাদের বিছানায় এসেছে। আর একটা ইঁদুর কোথা গেল? খুঁজে পাচ্ছি না যে—

দুর্বাসা আবার চিৎকার করে নাচতে লাগলেন। পল্টু বললে, ওই ওই, দাড়ির ভেতর একটা সেঁধিয়েছে!

অনুমতি না নিয়েই পল্টু দুর্বাসার দাড়িতে হস্তক্ষেপ করে তার

ভেতর থেকে ইঁদুরটাকে টেনে বার করলে। তার পর বললে, ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে কেন?

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, ঝুমঝুম শব্দ? বলিস কি রে! প্রভু, আপনার দাড়িটি একবার নাড়ুন তো।

দুর্বাসা দাড়ি নাড়লেন। সেই নিবিড় শ্মশ্রুজাল ভেদ করে ক্ষীণ শব্দ নির্গত হল—ঝুম ঝুম ঝুম। যেন নৃত্যপরা মেনকার নূপুর-নিক্কণ দূরদূরান্তর থেকে ভেসে আসছে।

পুলিন দাড়ির নীচের ঝুঁটিটা একবার টিপে দেখলে, তার পর গেরো খুলতে লাগল। দুর্বাসা বললেন, আরে লাগে লাগে! কে তাঁর কথা শোনে। আমি তাঁর মাথাটি জোর করে ধরে রইলুম, পুলিন পড়পড় করে দাড়ি ছিঁড়ে ভেতর থেকে ঝুমঝুমি বার করলে। সোনার কি রুপোর কি টিনের বোঝা গেল না, ময়লায় কালো হয়ে গেছে, কিন্তু বাজছে ঠিক।

পল্টু চুপি চুপি বললে, এক্স-রে করলে কোন্ কালে বেরিয়ে পড়ত, নয় বাবা? পল্টুর অভিজ্ঞতা আছে, বছর দুই আগে সে একটা পয়সা গিলেছিল।

দুর্বাসা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, একেই বলে গেরোর ফের। ঝুমঝুমিটি যে যত্ন করে দাড়ির গেরোর মধ্যে গুঁজে রেখেছিলুম তা মনেই ছিল না। তার পর পল্টুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, বৎস, আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হবে।

আমি বললুম, ও আশীর্বাদ আর ফলবার উপায় নেই প্রভু, রাজা টাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন ও মন্ত্রী হতে পারে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।

—বেশ, সেই আশীর্বাদ করছি। কিন্তু রাজা না থাকলে রাজকার্য চলবে কি করে?

—আজকাল তা চলে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে কর্তা না থাকলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

দুর্বাসা বললেন, আমি এখন উঠি। যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে সত্বর দায়মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে যেতে চাই।

—অর্পণ করবেন কাকে?

—কেন, মহারাজ ভরতের বংশধর নেই?

—কেউ নেই, ভরতবংশ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির-পরীক্ষিতের বংশ লোপ পেয়েছে। তাঁদের যাঁরা উত্তরাধিকারী—নন্দ মৌর্য শুঙ্গ অন্ধ্র গুপ্ত প্রভৃতি, তার পর পাঠান মোগল ইংরেজ, এঁরাও ফৌত হয়েছেন। ভরতের রাজ্য এখন দু ভাগ হয়েছে, বড়টি ভারতীয় গণরাজ্য, ছোটটি ইসলামীয় পাকিস্থান।

—একজন চক্রবর্তী রাজা আছেন তো?

—এখন আর নেই, দুই রাজ্যে দুই রাষ্ট্রপতি বাহাল হয়েছেন, একজন দিল্লিতে আর একজন করাচিতে থাকেন। আইন অনুসারে এঁরাই ভরতের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং ঝুমঝুমিটি এঁদেরই হক পাওনা। কিন্তু দেবেন কাকে? একজনকে দিলে আর একজন ইউ-এন-ও-তে নালিশ করবেন, না হয় ঘুষি বাগিয়ে বলবেন, লড়কে লেংগে ঝুমঝুম্মা।

দুর্বাসা ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। তার পর মট্ করে ঝুমঝুমিটি ভেঙে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা, যাতে পাথরকুচি আছে, নাড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিঁ পিঁ করে। দাও তো গোটা দশ টাকা রাহাখরচ।

টাকা নিয়ে দুর্বাসা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

১৩৫৮

রেবতীর পতিলাভ

বিষ্ণুপুরাণে রাজা রৈবত-ককুদ্মী ও তাঁর কন্যা বেবতীর একটি বিচিত্র আখ্যান আছে। সেই ছোট আখ্যানটি বিস্তাবিত করে লিখছি। এই পবিত্র পুরাণকথা যে কন্যা শ্রদ্ধাসহকাবে একাগ্রচিত্তে পাঠ করে তার অচিরে সর্বগুণান্বিত বাঞ্ছিত পতি লাভ হয।

পুরাকালে কুশস্থলী নগরীতে বৈবত-ককুদ্মী নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি রেবত রাজার পুত্র সেজন্য তাঁর এক নাম রৈবত, এবং ককুদ্যুক্ত বৃষ অর্থাৎ ঝুঁটিওয়ালা ষাঁড়েব তুল্য তেজস্বী সেজন্য অপর নাম ককুদ্মী। সেকালে মহত্ত্ব ও বীবত্বেব নিদর্শন ছিল সিংহ ব্যাঘ্র ও বৃষ, সেজন্য কীর্তিমান লোকেব উপাধি দেওয়া হত—পুরুষসিংহ, নরশার্দূল, ভরতর্ষভ, মুনিপুংগব, ইত্যাদি।

রৈবত রাজার রেবতী নামে একটি কন্যা ছিলেন, তিনি রূপে গুণে অতুলনা। রেবতী বড় হলে তাঁর বিবাহেব জন্য বাজা পাত্রের খোঁজ নিতে লাগলেন। অনেক পাত্রের বিবরণ সংগ্রহ করে বৈবত একদিন তাঁর কন্যাকে বললেন, দেখ বেবতী, আব বিলম্ব করতে পারি না, তোমার বয়স ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তুমি অত খুঁত ধরলে তোমার বরই জুটবে না। আমি বলি কি, তুমি কাশীরাজ তুন্দবর্ধনকে বিবাহ কর।

রেবতী ঠোঁট কুঁচকে বললেন, অত্যন্ত মোটা আব অনেক স্ত্রী। আমি সতিনের ঘর করতে পারব না।

রাজা বললেন, তবে গান্ধারপতি গন্ডবিক্রমকে বিবাহ কর, তাঁর স্ত্রী বেশী নেই।

—গণ্ডমূর্খ আর অনেক বয়স।

—আচ্ছা, ত্রিগর্ত দেশের যুবরাজ কড়ম্বকে কেমন মনে হয়?

—কাঠির মতন রোগা।

—কোশলরাজকুমার অর্ভক?

—সে তো নিতান্ত ছেলেমানুষ।

—তবে আর কথাটি নয়, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বরণ কর। অমন রূপবান ধনবান বলবান আর ধর্মপ্রাণ পাত্র সমগ্র জম্বুদ্বীপে নেই।

রেবতী বললেন, উনি তো দিনরাত হরি হরি করেন, ও রকম ভক্ত লোকের সঙ্গে আমার বনবে না।

রৈবত হতাশ হয়ে বললেন, তবে তুমি নিজেই একটা পছন্দ মতন স্বামী জুটিয়ে নাও। যদি চাও তো স্বয়ংবরের আয়োজন করতে পারি, যাকে মনে ধরবে তার গলায় মালা দিও।

—কার গলায় দেব? সব সমান অপদার্থ।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। যথাবিধি পূজা গ্রহণ করে কুশলপ্রশ্নের পর নারদ বললেন, তোমরা পিতা-পুত্রীতে কিসের বাদানুবাদ করছিলে?

রৈবত উত্তর দিলেন, আর বলবেন না দেবর্ষি। এখনকার মেয়েরা অত্যন্ত অবুঝ হয়েছে, কিছুতেই বর মনে ধরে না। আমি অনেক চেষ্টায় পাঁচটি ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু রেবতী কাকেও পছন্দ করছে না। স্বয়ংবরা হতেও চায় না, বলছে সব অপদার্থ। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

নারদ বললেন, রেবতী নিতান্ত অন্যায় কথা বলে নি, আজকাল রূপে গুণে উত্তম পাত্র পাওয়া দুরূহ। চেহারা দেখে আর খবর নিয়ে স্বভাব-চরিত্র জানা যায় না। এক কাজ কর, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ধর, তিনিই রেবতীর বর স্থির করে দেবেন।

রাজা বললেন, ব্রহ্মার নির্বাচিত বরও হয়তো রেবতীর মনে ধরবে না।

নারদ বললেন, না ধরবে কেন। আমাদের পিতামহ বিরিঞ্চি সর্বজ্ঞ, তাঁর নির্বাচনে ভুল হবে না। আর, তোমার কন্যারও তো কোনও বিশেষ পুরুষের উপর টান নেই। আছে নাকি রেবতী?

রেবতী ঘাড় নেড়ে জানালেন যে নেই।

নারদ বললেন, তবে আর কি, অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে যাত্রা কর। আমি এখন কুবেরের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে বলব তোমাদের যাতায়াতের জন্য পুষ্পক রথটা পাঠিয়ে দেবেন।

রাজা করজোড়ে বললেন, দেবর্ষি, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন, নইলে ভরসা পাব না।

নারদ বললেন, বেশ, আমি শীঘ্রই কুবেরপুরী থেকে রথ নিয়ে এখানে আসব, তার পর একসঙ্গে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যাবে।

নারদ ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে রৈবত-ককুদ্মী ও রেবতী পুষ্পক বিমানে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। তখন হিমালয় এখনকার মতন উঁচু হয় নি, মাথায় সর্বদা বরফ জমে থাকত না। হিমালয়ের উত্তর দিকে সমুদ্রতুল্য বিশাল একটি হ্রদ ছিল। তাঁরা হিমালয় হেমকূট নিষধ প্রভৃতি পর্বতমালা এবং হৈমবত হরি ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ অর্থাৎ বড় বড় দেশ অতিক্রম করে দুর্গম ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হলেন। সেই অলৌকিক সভার বিবরণ দেবার চেষ্টা করব না, মহাভারতে আছে যে তা অবর্ণনীয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়।

নারদের সঙ্গে রৈবত আর রেবতী যখন ব্রহ্মসভায় প্রবেশ করলেন

তখন সেখানে গীত বাদ্য নৃত্য চলছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা একটি উচ্চ বেদীতে রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করছেন, তাঁর বামে ব্রহ্মাণী এবং চারি পাশে দক্ষ প্রচেতা সনৎকুমার অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা এবং আদিত্য রুদ্র বসু প্রভৃতি গণদেবতা বসে আছেন। দুই বিখ্যাত গন্ধর্ব কালোয়াত হাহা হুহু অতিতান-রাগে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে গান গাইছেন, অন্য দুই গন্ধর্ব তুম্বুরু ও ডুম্বুরু দুন্দুভি অর্থাৎ দামামা বাজাচ্ছেন। তখন মৃদঙ্গ আর বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি হয় নি। দশজন বিদ্যাধর দশটি প্রকাণ্ড বীণায় ঝংকার দিচ্ছেন এবং উর্বশী রম্ভা মেনকা ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরার দল ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছেন। একজন মহাকায় দানব একটি অজগরতুল্য রামশিঙা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে তাতে ফুঁ দিয়ে প্রচণ্ড নিনাদে শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করছে। সভাস্থ সকলে তন্ময় হয়ে সংগীত-রস পান করছেন এবং ভাবের আবেশে মাথা দোলাচ্ছেন।

ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রণাম করে নারদ নিঃশব্দে সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বসলেন। একজন বেত্রধারিণী প্রতিহারী যক্ষী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রৈবত ও রেবতীর কাছে এল এবং ইঙ্গিত করে ডেকে নিয়ে তাঁদের সুখাসনে বসিয়ে দিলে।

একটু পরেই আব্রহ্ম-দেব-গন্ধর্ব-মানব প্রভৃতি সভাস্থ সকলে সবেগে মাথা আর হাত নেড়ে বলে উঠলেন—হা-হা-হাঃ! সাধু সাধু, অতি উত্তম! নৃত্যগীতবাদ্য নিবৃত্ত হল। ব্রহ্মা তখন রৈবত ও রেবতীর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিকটে আসবার জন্য সংকেত করলেন।

পিতা-পুত্রী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ব্রহ্মা বললেন, রাজা, তোমার কন্যাটি তো দেখছি পরমা সুন্দরী, বড়ও হয়েছে, এর বিবাহ দাও নি কেন?

রৈবত বললেন, ভগবান, কন্যার বিবাহের জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমি অনেক ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু রেবতী কাকেও পছন্দ করছে না। কাশীরাজ তুন্দবর্ধন, গান্ধারপতি গণ্ডবিক্রম, ত্রিগর্তযুবরাজ কড়ম্ব, কোশলরাজকুমার অর্ভক, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ—

ব্রহ্মা স্মিতমুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

রৈবত বললেন, আপনিও কি এঁদের সুপাত্র মনে করেন না?

ব্রহ্মা বললেন, ওরা কেউ এখন জীবিত নেই, ওদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদিও গত হয়েছে।

—বলেন কি পিতামহ!

—হাঁ, সব পঞ্চত্ব পেয়েছে। তোমারও আত্মীয়-স্বজন কেউ জীবিত নেই।

মস্তকে করাঘাত করে রৈবত বললেন, হা হতোস্মি! ভগবান, আমার রাজ্যের আর সকলে কেমন আছে? মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত রেখে আপনার চরণদর্শনে এসেছি, এর মধ্যে অকস্মাৎ কোন্ দুর্বিপাকে আমার আত্মীয়বর্গ বিনষ্ট হল? আমার কোন্ পাপের এই পরিণাম?

ব্রহ্মা বললেন, মহারাজ, শান্ত হও। অকস্মাৎ বা তোমার পাপের ফলে কিছুই হয় নি, যথাবিধি কালবশে ঘটেছে। তোমার মন্ত্রী মিত্র ভৃত্য কলত্র বন্ধু প্রজা সৈন্য ধন কিছুই অবশিষ্ট নেই, কেবল তুমি আর তোমার কন্যা আছ।

আকুল হয়ে রৈবত বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, স্বপ্ন নয়, সবই সত্য। আমি তোমাকে

বুঝিয়ে দিচ্ছি। জান তো, আমার এক অহোরাত্র হচ্ছে মানুষের ৮৬৪ কোটি বৎসর। আচ্ছা, তুমি এই সভায় কতক্ষণ এসেছ?

রৈবত একটু ভেবে বললেন, বেশীক্ষণ নয়, সওয়া দণ্ড হবে।

ব্রহ্মা বললেন, গণনা করে বল তো, আমার এই ব্রহ্মসভার সওয়া দণ্ডে নরলোকের কত বৎসর হয়?

মাথা চুলকে রৈবত বললেন, ভগবান, আমি গণিতশাস্ত্রে চির-কালই কাঁচা। দেবর্ষি নারদ যদি কৃপা করে অঙ্কটি কষে দেন—

নারদ বললেন, হরে মুরারে! অঙ্ক টঙ্ক আমার আসে না, ও হল নীচ গ্রহবিপ্রের কাজ। রেবতী, তুমি তো শুনেছি খুব বিদুষী, নানা বিদ্যা জান, বল না কত হয়।

রেবতী বললেন, পিতামহ ব্রহ্মার এক অহোরাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় যদি মানুষের ৮৬৪ কোটি বৎসর হয়, তবে সওয়া দণ্ডে অর্থাৎ আধ ঘণ্টায় কত বৎসর হবে—এই তো? তা হল গিয়ে ১৮ কোটি বৎসর। ভগবান, ভুল হয় নি তো?

ব্রহ্মা বললেন, না না, ঠিক হয়েছে। মহারাজ, বুঝতে পারলে? তুমি যতক্ষণ এখানে সংগীত শুনছিলে ততক্ষণে নরলোকে আঠারো কোটি বৎসর কেটে গেছে। তোমরা সত্যযুগের গোড়ায় এসেছিলে, তার পর বহু চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন যে চতুর্যুগ চলছে তারও সত্য ত্রেতা গত হয়েছে, দ্বাপরও গতপ্রায়, কলিযুগ আসন্ন।

শোকে অবসন্ন হয়ে রৈবত বললেন, ভগবান, আমার গতি কি হবে?

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, কি আবার হবে, তোমার ভাববার কিছু নেই। এখন ফিরে গিয়ে কন্যার বিবাহ দাও, তাহলেই তুমি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। অমরাবতী তুল্য তোমার যে রাজধানী ছিল —কুশস্থলী, তার নাম এখন দ্বারকাপুরী হয়েছে, তা যাদবগণের

অধিকারে আছে। পরমেশ্বর বিষ্ণু সম্প্রতি নরলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাদববংশে জন্মগ্রহণ করে স্বকীয় অংশে বলদেবরূপে নরলীলা করছেন। সেই মায়ামানব বলদেবকে তোমার কন্যা দান কর। তিনি আর রেবতী সর্বাংশে পরস্পরের যোগ্য।

রৈবত বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য, বলদেবকেই কন্যা-দান করব। কিন্তু আমার গতি কি হবে প্রভু?

—আবার বলে গতি কি হবে! বৃদ্ধ হয়েছ, একমাত্র সন্তান রেবতীকে সৎপাত্রে দিচ্ছ, আর তোমার বেঁচে থেকে লাভ কি, রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি? তোমার রাজ্য তো রেবতীরই শ্বশুর-বংশের অধিকারে আছে। মেয়ের বিবাহ দিয়ে তুমি সোজা ব্রহ্মলোকে ফিরে এস এবং সশরীরে আমার কাছে সুখে বাস কর। এর চাইতে আর কি সদ্‌গতি চাও?

রৈবত বললেন, তাই হবে প্রভু। কিন্তু দেবর্ষি নারদও আমার সঙ্গে মর্ত্যলোকে চলুন, আমি বড় অসহায় বোধ করছি।

নারদ বললেন, বেশ তো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। কোনও চিন্তা ক'রো না, রেবতীর বিবাহব্যাপারে আমি তোমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করব।

ফেরবার সময় রৈবত ও রেবতী আকাশ থেকে দেখলেন, হিমালয়ের উত্তরে যেখানে নিম্নভূমি ছিল সেখানে অত্যুচ্চ মালভূমির উদ্‌ভব হয়েছে। যে জলরাশি ছিল তা শুখিয়ে বালুকা-ময় মরুভূমি হয়ে গেছে। হিমালয় আর ঢিপির মতন নেই, সুবিশাল অধিত্যকা আর উপত্যকায় তরঙ্গায়িত হয়েছে, শত শত চূড়া আকাশে উঠেছে, তার উপর দিক তুষারে আচ্ছন্ন, সেই তুষার সূর্যতাপে

দ্রবীভূত হয়ে অসংখ্য নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। গাছপালাও আর আগের মতন নেই, জন্তুদের আকৃতিও বদলে গেছে। নারদ বুঝিয়ে দিলেন যে বিগত আঠারো কোটি বৎসরে ধীরে ধীরে এইসব প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে।

পুষ্পক রথ যখন রৈবত-ককুদ্মীর ভূতপূর্ব রাজ্যের নিকটে এল তখন নারদ বললেন, মহারাজ, লোকালয়ে নেমে কাজ নেই, লোকে তোমাদের রাক্ষস মনে করে গোলযোগ বাধাতে পারে।

রৈবত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, রাক্ষস মনে করবে কেন? কালক্রমে মানুষের বুদ্ধিও কি লোপ পেয়েছে?

নারদ বললেন, আমাকে দেখে কিছু বলবে না, কারণ আমার অণিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য আছে, ইচ্ছামত লম্বা কিংবা বেঁটে হয়ে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি। কিন্তু তোমাদের তো সে শক্তি নেই।

—কিছুই বুঝতে পারছি না দেবর্ষি। আবার কি নূতন সংকট উপস্থিত হল?

—নূতন কিছু হয় নি, সবই যুগপরিবর্তনের ফল। তোমরা সত্যযুগের গোড়ায় জন্মেছ, যুগলক্ষণ অনুসারে তুমি লম্বায় একুশ হাত। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে একটু খাটো হয়, তাই রেবতী উনিশ হাত লম্বা। কিন্তু ও এখনও ছেলেমানুষ, পরে আরও আধ হাত বাড়বে।

—আপনি কি যা-তা বলছেন! আমার এই রাজদণ্ডটি ঠিক এক হাত। এই দিয়ে আমাকে মেপে দেখুন না, আমি লম্বায় বড় জোর চার হাত হব।

—তোমার হাতের মাপে তাই হতে পার বটে, কিন্তু সে মাপ ধরছি না। কলিযুগে মানুষের হাতের যে মাপ, সকল শাস্ত্রে তাই

প্রামাণিক গণ্য হয়। সেই কলিযুগীয় মাপে তুমি একুশ হাত আর রেবতী উনিশ হাত লম্বা।

—তা হলেই বা ক্ষতি কি?

—সত্যযুগে মানুষ যেমন একুশ হাত লম্বা, তেমনি ত্রেতায় চোদ্দ হাত, দ্বাপরে সাত হাত, কলিতে সাড়ে তিন হাত। এখন নরলোকে দ্বাপরের অন্তিম দশা, কলিযুগ আসন্ন, সেজন্য মানুষ খাটো হতে হতে চার হাতে দাঁড়িয়েছে, বড় জোর সওয়া চার হাত। এখনকার বেঁটে লোকরা যদি সহসা তোমাদের দেখে তবে রাক্ষস মনে করে ইট পাথর ছুড়বে। বিবাহের পূর্বে এরকম গোলযোগ হওয়া কি ভাল?

—আমাদের কি কর্তব্য আপনিই বলুন।

নারদ বললেন, নীচে ওই পাহাড়টি চিনতে পারছ?

রৈবত বললেন, হাঁ হাঁ খুব পারছি, ও তো আমারই প্রমোদগিরি, ওর উপরে নীচে অনেক উপবন আছে, রেবতী ওখানে বেড়াতে ভালবাসে।

—রাজা, তুমি কীর্তিমান। আঠারো কোটি বৎসর অতীত হয়েছে তথাপি লোকে তোমাকে ভোলে নি, তোমার নাম অনুসারে ওই পর্বতের নাম দিয়েছে রৈবতক। ওখানেই রথ নামানো হক। রেবতীর বিবাহ পর্যন্ত তুমি ওখানে গোপনে বাস কর।

একটু উত্তেজিত হয়ে রৈবত বললেন, লুকিয়ে থাকব কার ভয়ে? এ তো আমারই রাজ্য। আর, আপনিই তো বলছেন এখনকার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। আমি একাই সকলকে যমালয়ে পাঠিয়ে নিজ রাজ্য অধিকার করব।

নারদ বললেন, মহারাজ রৈবত-ককুদ্মী, তুমি সার্থকনামা, এক-গুঁয়ে ষাঁড়ের মতন কথা বলছ, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। সকলকে

মেরে ফেললে কাকে নিয়ে রাজত্ব করবে? তোমার ভাবী জামাতার বংশ ধ্বংস হলে রেবতীর বিবাহ কি করে হবে? ওসব কুবুদ্ধি ত্যাগ কর।

রৈবত বললেন, আমার মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেছে। আপনি যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।

ইন্দ্রের দিব্য বিমানের একজন সারথি আছে—মাতলি। কুবেরের পুষ্পক রথ আরও উঁচু দরের, সারথির দরকার হয় না। রথটি সচেতন ও জ্ঞানবান, কথা বুঝতে পারে, বলতেও পারে। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

নারদ বললেন, বৎস পুষ্পক, তুমি যথাসম্ভব নিম্নমার্গে ওই রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে উড়তে থাক। পুষ্পক 'যে-আজ্ঞে' বলে মণ্ডলাকারে চলতে লাগল। তিন বার প্রদক্ষিণের পর নারদ বললেন, আমার সব দেখা হয়েছে, এইবারে অবতরণ কর। পুষ্পক রথ ভূমিস্পর্শ করে স্থির হল।

সকলে নামলে নারদ বললেন, পর্বতের এই পশ্চিম দিকটি বেশ নির্জন, বাসের উপযুক্ত গুহাও আছে। তোমরা এখন এখানেই থাক। আমি বরের পিতা বসুদেবের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মার ইচ্ছা জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করব। তোমরা স্নানাদি সেরে নিয়ে আহার ও বিশ্রাম কর। পিতামহী ব্রহ্মাণী প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন, শয্যাও রথে আছে, সেসব নামিয়ে নাও। আমি রথ নিয়ে যাচ্ছি, শীঘ্রই ফিরে আসব।

নারদ চলে গেলেন। স্নান ও আহারের পর রেবতী একটি গুহায় বিছানা পেতে বললেন, পিতা, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি

একটু বেড়িয়ে আসছি। রৈবত বললেন, তা বেড়াও গে, কিন্তু ফিরতে বেশী দেরি ক'রো না যেন।

রৈবতকের পাদবর্তী উপবনে বেড়াতে বেড়াতে রেবতী নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবতে লাগলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শুধু পিতা আছেন, বিবাহের পর তিনিও ব্রহ্মলোকে চলে যাবেন। যিনি রেবতীর একমাত্র ভাবী অবলম্বন, সেই বলদেব কেমন লোক? ব্রহ্মা যাঁকে নির্বাচন করেছেন তিনি কুপাত্র হতে পারেন না—এ বিশ্বাস তাঁর আছে। কিন্তু নারদ যা বলেছেন সে যে বড় ভয়ানক কথা। রেবতী উনিশ হাত লম্বা, পরে আরও একটু বাড়বেন। কিন্তু তাঁর ভাবী স্বামী বলদেব যুগধর্ম অনুসারে নিশ্চয় খুব বেঁটে, বড় জোর সওয়া চার হাত, অর্থাৎ মানুষের তুলনায় যেমন বেরাল। এমন বিসদৃশ বেমানান বেয়াড়া দম্পতির কথা রেবতী কস্মিন্‌ কালে শোনেন নি। মাকড়সা-জাতির মধ্যে দেখা যায় বটে—স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু তার পরিণাম বড়ই করুণ, মিলনের পরেই স্ত্রী-মাকড়সা তার ক্ষুদ্র পতিটিকে ভক্ষণ করে ফেলে। ছি ছি, রেবতীর কপালে কি এই আছে? বরকন্যার এই বিশ্রী বৈষম্যের কথা কি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা আর নারদের খেয়াল হয় নি? দেবতা আর দেবর্ষি হলে কি হবে, দুজনেরই ভীমরতি ধরেছে।

রেবতী একটি বকুল গাছে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলেন। দুঃখে তাঁর কান্না এল। হঠাৎ পিছন দিকে মৃদু মর্মর শব্দ শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, একটি অতি ক্ষুদ্র মূর্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার নূতন মেঘের ন্যায় তার কান্তি, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা গোছা গোছা কালো চুল সরু ফিতের মতন সোনার পটি দিয়ে ঘেরা, তার এক পাশে একটি ময়ূরের পালক বাঁকা করে গোঁজা। পরনে বাসন্তী রঙের ধুতি, গায়েও সেই রঙের

উত্তরীয়, গলায় আজানুলম্বিত বনমালা। অতি সুশ্রী সুঠাম কিশোর বিগ্রহ। রেবতী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি, মানুষ না পুতুল?

সহাস্যে নমস্কার করে সেই অদ্ভুত মূর্তিটি উত্তর দিলে, আমি আপনার আজ্ঞাবহ কিংকর।

—তোমার নাম কি, পরিচয় কি? কিজন্য এখানে এসেছ?

—আমার নাম কৃষ্ণ, আমি বসুদেবের পুত্র, বলদেবের অনুজ। আপনি আমার ভাবী জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া, পূজনীয়া বধূঠাকুরাণী, তাই প্রণাম করতে এসেছি।

অবজ্ঞা ও কৌতুক মিশ্রিত স্বরে রেবতী বললেন, আমাকে দেখে ভয় করছে না? শুনেছি তোমার দাদা নাকি একটি অবতার, নারায়ণের অংশে জন্মেছেন। তুমিও অবতার নাকি?

কৃষ্ণ বললেন, আমি অত ভাগ্যবান নই, দশ অবতারের তালিকায় আমার নাম ওঠে নি। এখন আমার বার্তা শুনুন। দেবর্ষি নারদ আমার পিতার কাছে গিয়ে আপনার সঙ্গে বলদেবের বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। পিতা পরমানন্দে সম্মত হয়েছেন। কালই বিবাহ। আমার অগ্রজ এখনই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন, সেই সুসংবাদ দেবার জন্য আমি তাঁর অগ্রদূত হয়ে এসেছি।

রেবতী প্রশ্ন করলেন, সম্পর্কে তুমি আমার কে হবে? শ্যালক?

কলহাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, আপনি দেখছি নিতান্ত সেকেলে, কাকে কি বলতে হয় তাও জানেন না। পত্নীর ভ্রাতাই শ্যালক, পতির ভ্রাতাকে তা বলতে নেই। আমি আপনার দেবর। এই যে, দাদা এসে গেছেন।

রেবতী দেখলেন, তাঁর ভাবী স্বামী কৃষ্ণের চাইতে ঈষৎ লম্বা আর মোটা, রজতগিরিতুল্য শুভ্র কান্তি, চন্দনচর্চিত প্রশস্ত বক্ষ,

বলিষ্ঠ বাহু, নীল চোখ, সিংহকেশরের মতন কটা রঙের চুল মুক্তা-মালা দিয়ে ঘেরা, তার এক পাশে একটি সারসের পালক গোঁজা। পরনে নীল ধুতি, গায়ে নীল উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা। কাঁধে বাঁশের লাঠি, তার উপর দিকে একটি সুমার্জিত লাঙ্গলের ফলা লাগানো, অস্তগামী সূর্যের কিরণে তা ঝকমক করছে।

দীর্ঘাঙ্গী রেবতী উনিশ হাত উঁচু থেকে তাঁর ভাবী স্বামীকে যুগপৎ সতৃষ্ণ ও বিতৃষ্ণ নয়নে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করলেন। হা বিধাতা, এই একরত্তি পুরুষ তাঁর বর! এত সুন্দর কিন্তু এত ক্ষুদ্র! রেবতী কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলেন এবং শিষ্টাচার স্মরণ করে যুক্ত করে নমস্কার জানালেন।

বলদেব স্মিতমুখে বললেন, ভদ্রে, আমাকে মনে ধরে?

রেবতী উত্তর দিলেন, শুনেছি আপনি একজন অবতার, নারায়ণের অংশে জন্মেছেন। আমার মতন সামান্য নারী কি আপনার যোগ্য?

বলদেব বললেন, অর্থাৎ আমিই তোমাব যোগ্য নই। তুমি অতিকায়া মহামানবী, আমি ক্ষুদ্রদেহ মাণবক। তুমি উচ্চ তালতরু, আমি তুচ্ছ এরণ্ড। তুমি তেতলা সমান উঁচু, আর আমি একটা উইঢিপি। রেবতী, তুমি ভাবছ আমি তোমার নাগাল পাব কি করে। দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর, আমি এখনই তোমার যোগ্য হব।

এই বলে বলদেব একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন এবং কাঁধ থেকে লাঙ্গলটি নামিয়ে তার দণ্ড ধরে বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন। ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটি লম্বা হতে লাগল। একটু পরে কৃষ্ণ বললেন, ওই হয়েছে, আর ঘুরিও না দাদা। তখন বলদেব লাঙ্গলের ফলা রেবতীর কাঁধে আটকে বললেন, সুন্দরী, অপরাধ নিও না, এই লাঙ্গল আমার বাহুর প্রতিনিধি হয়ে তোমার কম্বুগ্রীবা আলিঙ্গন করছে।

রেবতী মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল হয়ে রইলেন। বলদেব ধীরে ধীরে লাঙগলদণ্ড আকর্ষণ করলেন। সলতে টেনে নিলে প্রদীপের শিখা যেমন ক্রমশ ছোট হতে থাকে, রেবতীও সেইরকম ছোট হতে লাগলেন। কৃষ্ণ সতর্ক হয়ে দেখছিলেন। বলে উঠলেন, থাম থাম, আর নয়—এঃ দাদা, তুমি বড্ড বেশী টেনে ফেলেছ!

বলদেব লাঙগল নামিয়ে নিলেন। তার পর নিজের হাত দিয়ে রেবতীকে মেপে বললেন, তাই তো, করেছি কি, রেবতী তিন হাত হয়ে গেছে! আচ্ছা, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি রেবতীকে তুলে ধরে বললেন, প্রিয়ে, আমার অপটুতা মার্জনা কর। তুমি এই বকুলশাখা অবলম্বন করে ক্ষণকাল ঝুলতে থাক।

রেবতীর তখন ভাববার শক্তি নেই। তিনি দু হাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলতে লাগলেন, বলদেব তাঁর দুই পা ধরে ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, আর একটু—আরও একটু—এই-বারে থাম, ঠিক হয়েছে।

রেবতীকে নামিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে বলদেব সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ, বর বড় না কনে বড়?

কৃষ্ণ বললেন, লম্বায় কনে সাত আঙুল ছোট, কিন্তু মর্যাদায় তোমার চাইতে ঢের বড়, কারণ ইনি আঠারো কোটি বৎসর আগে জন্মেছেন। চমৎকার মানিয়েছে। এই বলে কৃষ্ণ দুজনকে প্রণাম করলেন।

নিকটে একটি ছোট জলাশয় ছিল। রেবতীকে তার ধারে এনে যুগল মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলদেব বললেন, রেবতী, দেখ তো, এইবারে আমি তোমার যোগ্য হয়েছি কিনা। এখন মনে ধরেছে কি?

রেবতী বললেন, মনে না ধরলেই বা উপায় কি। অবতার না আরও কিছু! দুই ভাই দুটি ডাকাত। তোমাদের মতলব আগে টের পেলে আমিই দুজনকে টেনে লম্বা করে দিতুম।

তার পর মহা সমারোহে রেবতী-বলদেবের বিবাহ হয়ে গেল। রৈবত-ককুদ্মী বরকন্যাকে আশীর্বাদ করে নারদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন।

১৩৫৮

লক্ষ্মীর বাহন

সাত বৎসর পরে মুচুকুন্দ রায় আলিপুর জেল থেকে খালাস পেলেন। তাঁকে নিতে এলেন শুধু তাঁর শালা তারাপদবাবু; দুই ছেলের কেউ আসে নি। মুচুকুন্দ যদি বিপ্লবী বা কংগ্রেসী আসামী হতেন তবে ফটকের সামনে আজ অভিনন্দনকারীর ভিড় লেগে যেত, ফুলের মালা চন্দনের ফোঁটা জয়ধ্বনি—কিছুরই অভাব হত না। যদি তিনি জেলে যাবার আগে প্রচুর টাকা সরিয়ে রাখতে পারতেন, উকিল ব্যারিস্টার যদি তাঁকে চুষে না ফেলত, তা হলে অন্তত আত্মীয় বন্ধুরা অনেকে আসতেন। কিন্তু নিঃস্ব অরাজনীতিক জেল-ফেরত লোককে কেউ দেখতে চায় না। ভালই হল, মুচুকুন্দ-বাবু মুখ দেখাবার লজ্জা থেকে বেঁচে গেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ি গেলেন না; কারণ বাড়িই নেই, বিক্রি হয়ে গেছে। তিনি তাঁর শালার সঙ্গে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে এলেন; সেখানে তাঁর স্ত্রী মাতঙ্গী দেবী অপেক্ষা করছিলেন। তার পর দুপুরের ট্রেনে তাঁরা কাশী রওনা হলেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সেখানেই বাস করবেন; মাতঙ্গী দেবীর হাতে যে টাকা আছে, তাতেই কোনও রকমে চলে যাবে।

মুচুকুন্দবাবুর এই পরিণাম কেন হল? এ দেশের অসংখ্য কৃতকর্মা চতুর লোকের যে নীতি মুচুকুন্দরও তাই ছিল। যুধিষ্ঠির বোধ হয় একেই মহাজনের পন্থা বলেছেন। এঁদের একটি অলিখিত ধর্মশাস্ত্র আছে; তাতে বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম শ্যাম যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট

মিউনিসিপ্যালিটি রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না। যদিই বা কিঞ্চিৎ অপরাধ হয় তবে ধর্মকর্ম আর লোক-হিতার্থে কিছু দান করলে সহজেই তা খণ্ডন করা যেতে পারে। বণিকের একটি নাম সাধু, পাকা ব্যবসাদার মাত্রেই পাকা সাধু। মুচুকুন্দর দুর্ভাগ্য এই যে তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি, দৈব তাঁর পিছনে লেগেছিল।

দুর্দশাগ্রস্ত মুচুকুন্দবাবু আজকাল কি করছেন তা জানবার আগ্রহ কারও থাকতে পারে না। কিন্তু এককালে তাঁর খুঁটিনাটি সমস্ত খবরের জন্য লোকে উৎসুক হয়ে থাকত, তাঁর নাম-ডাকের সীমা ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি মুচুকুন্দ, ভারতজ্যোতি বঙ্গচন্দ্র কলিকাতাভূষণ মুচুকুন্দ—এইসব কথা ভক্তদের মুখে শোনা যেত। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা বলতেন, ধন্য শ্রীমুচুকুন্দ, যাঁর কীর্তিতে কুল পবিত্র হয়েছে, জননী কৃতার্থা হয়েছেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়েছেন। বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, বাহাদুর বটে মুচুকুন্দ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ আর গভর্নমেণ্ট সর্বত্র ওঁর খাতির; ভদ্রলোক বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, উনি একাই সমস্ত মারোয়াড়ী গুজরাটী পারসী আর পঞ্জাবীর কান কাটতে পারেন, লাট মন্ত্রী পুলিস—সবই ওঁর মুঠোর মধ্যে। বকাট ছেলেরা বলত, মুচুর মতন মানুষ হয় না মাইরি, চাইবামাত্র আমাদের সর্বজনীনের জন্যে পাঁচ শ টাকা ঝড়াক্‌সে ঝেড়ে দিলে। সেই আট-দশ বৎসর আগেকার প্রখ্যাতনামা উদ্‌যোগী পুরুষসিংহের কথা এখন বলছি।

মুচুকুন্দ রায়ের প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড মোটর, প্রকাণ্ড পত্নী। তিনি নিজে একটু বেঁটে আর পেট-মোটা, কিন্তু তার জন্য তাঁর আত্ম-সম্মানের হানি হয় নি; বন্ধুরা বলতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে

নেপোলিয়নের খুব মিল আছে। ইংরেজ জার্মন মার্কিন প্রভৃতির খ্যাতি শোনা যায় যে তারা সব কাজ নিয়ম অনুসারে করে; কিন্তু মুচুকুন্দ তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। সদ্য অয়েল করা দামী ঘড়ির মতন সুনিয়ন্ত্রিত মসৃণ গতিতে তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পরিহাস করে বলেন, তাঁর কাছে দাঁড়ালে টিকটিক শব্দ শোনা যায়। আরও আশ্চর্য এই যে, ইহকাল আর পরকাল দুদিকেই তাঁর সমান নজর আছে, তবে ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে মাথা ঘামান না, তাঁর পত্নীর আজ্ঞাই পালন করেন।

প্রত্যহ ভোর পাঁচটার সময় মুচুকুন্দর ঘুম ভাঙে; সেই সময় একজন মাইনে করা বৈরাগী রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে পাঁচ মিনিট হরিনাম শোনায়। তার পর প্রাতঃকৃত্য সারা হলে একজন ডাক্তার তাঁর নাড়ীর গতি আর ব্লাডপ্রেশার দেখে বলে দেন আজ সমস্ত দিনে তিনি কতখানি ক্যালরি প্রোটিন ভাইটামিন প্রভৃতি উদরস্থ করবেন এবং কতটা পরিশ্রম করবেন। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত পুরুত ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করেন, মুচুকুন্দ কাগজ পড়তে পড়তে চা খেতে খেতে তা শোনেন। তার পর নানা লোক এসে তাঁর নানা রকম ছোটখাটো বেনামী কারবারের রিপোর্ট দেয়। যেমন—রিকশ, ট্যাক্সি, লরি, হোটেল, দেশী মদের এবং আফিম গাঁজা ভাং চরসের দোকান ইত্যাদি। বেলা নটার সময় একজন মেদিনীপুরী নাপিত তাঁকে কামিয়ে দেয়, তার পর দুজন বেনারসী হাজাম তাঁকে তেল মাখিয়ে আপাদমস্তক চটকে দেয়, যাকে বলে দলাই-মলাই বা মাসাঝ। দশটার সময় একজন ছোকরা ডাক্তার তাঁর প্রস্রাব পরীক্ষা করে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেয়। তার পর মুচুকুন্দ চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করে বিশ্রাম করেন এবং ঠিক পৌনে বারোটায় প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে তাঁর অফিসে হাজির হন।

বড় বড় ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ মুচুকুন্দ তাঁর অফিসেই নির্বাহ করেন। অনেক লিমিটেড কম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি তাঁর হাতে, কাপড়-কল, চট-কল, চা-বাগান, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক, ইনশিওরেন্স ইত্যাদি; তা ছাড়া তিনি কনট্রাক্টারিও করেন। কাজ শেষ হলে তিনি মোটরে চড়ে একটু বেড়ান এবং ঠিক ছটার সময় বাড়িতে ফেরেন। তার পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করে তাঁর ড্রইংরুমে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তাঁর অনুগত বন্ধু আর হিতৈষীরাও একে একে উপস্থিত হন। এই সময় ভক্তিরত্ন মশাই আধ ঘণ্টা ভাগবত পাঠ করেন, মুচুকুন্দ গল্প করতে করতে তা শোনেন।

মুচুকুন্দর ধনভাগ্য যশোভাগ্য পত্নীভাগ্য সবই ভাল, কিন্তু ছেলে দুটো তাঁকে নিরাশ করেছে। বড় ছেলে লখা (ভাল নাম লক্ষ্মীনাথ) কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে গেছে, দু বেলা বাড়িতে এসে তার মায়ের কাছে খেয়ে যায়, তার পর দিন রাত কোথায় থাকে কেউ জানে না। মুচুকুন্দ বলেন, ব্যাটা পয়লা নম্বর গর্ভস্রাব। ছোট ছেলে সরা (ভাল নাম সরস্বতীনাথ) লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু কলেজ ছেড়েই ঝাঁকড়া চুল আর জুলফি রেখে আল্ট্রা-আধুনিক সুপার-দুর্বোধ্য কবিতা লিখছে। অনেক চেষ্টা করেও মুচুকুন্দ তাকে অফিসের কাজ শেখাতে পারেন নি, অবশেষে হতাশ হ'য়ে বলেছেন, যা ব্যাটা দু নম্বর গর্ভস্রাব, কবিতা চুষেই তোকে পেট ভরাতে হবে। মুচুকুন্দর শালা তারাপদই তাঁর প্রধান সহায়, একটু বোকা, কিন্তু বিশ্বস্ত কাজের লোক।

মুচুকুন্দ-গৃহিণী মাতঙ্গী দেবী লম্বা-চওড়া বিরাট মহিলা (হিংসুটে মেয়েরা বলে একখানা একগাড়ি মহিলা), যেমন কর্মিষ্ঠা তেমনি ধর্মিষ্ঠা। আধুনিক ফ্যাশন আর চাল-চলন তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। ধর্মকর্ম ছাড়া তাঁর অন্য কোনও শখ নেই, কেবল

নিমন্ত্রণে যাবার সময় এক গা ভারী ভারী গহনা আর ন্যাফথালিন-বাসিত বেনারসী পরেন। তিনি স্বামীর সব কাজের খবর রাখেন এবং ধনবৃদ্ধি আর পাপক্ষয় যাতে সমান তালে চলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। মুচুকুন্দ যদি অর্থের জন্য কোনও কুকর্ম করেন তবে মাতঙ্গী বাধা দেন না, কিন্তু পাপ খণ্ডনের জন্য স্বামীকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনেন, তেমন তেমন হলে স্বস্ত্যয়ন আর ব্রাহ্মণভোজনও করান। মুচুকুন্দর অট্টালিকায় বার মাসে তের পার্বণ হয়, পুরুত ঠাকুরের জিম্মায় গৃহদেবতা নারায়ণশিলাও আছেন। কিন্তু মাতঙ্গীর সব চেয়ে ভক্তি লক্ষ্মীদেবীর উপর। তাঁর পুজোর ঘরটি বেশ বড়, মারবেলের মেঝে, দেওয়ালে নকশা-কাটা মিনটন টালি, লক্ষ্মীর চৌকির উপর আলপনাটি একজন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর ছবি ঝুলছে এবং উঁচু বেদীর উপর একটি রুপোর তৈরী মাদ্রাজী লক্ষ্মীমূর্তি আছে। মাতঙ্গী রোজ এই ঘরে পুজো করেন, বৃহস্পতিবারে একটু ঘটা করে করেন। সম্প্রতি তাঁর স্বামীর কারবার তেমন ভাল চলছে না সেজন্য মাতঙ্গী পুজোর আড়ম্বর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আজ কোজাগর পূর্ণিমা, মুচুকুন্দ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সহ-ধর্মিণীর সঙ্গে ব্রতপালন করছেন। সমস্ত রাত দুজনে লক্ষ্মীর ঘরে থাকবেন, মাতঙ্গী মোটেই ঘুমুবেন না, স্বামীকেও কড়া কফি আর চুরুট খাইয়ে জাগিয়ে রাখবেন। শাস্ত্রমতে এই রাত্রে জুয়া খেলতে হয় সেজন্য মাতঙ্গী পাশা খেলার সরঞ্জাম আর বাজি রাখবার জন্য শ-খানিক টাকা নিয়ে বসেছেন। মুচুকুন্দ নিতান্ত অনিচ্ছায় পাশা খেলছেন, ঘন ঘন হাই তুলছেন আর মাঝে মাঝে কফি খাচ্ছেন।

রাত বারটার সময় পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের মাথার উপর উঠল। ঘরে পাঁচটা ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে এবং খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর জ্যোৎস্না আসছে। মুচুকুন্দ আর মাতঙ্গী দেখলেন, জানালার বাইরে একটা বড় পাখি নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, তার ডানায় চাঁদের আলো পড়ে ঝকমক করে উঠছে। মাতঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন, কি পাখি ওটা? মুচুকুন্দ বললেন, পেঁচা মনে হচ্ছে। পাখিটা হঠাৎ হুহু-হুম হুহু-হুম শব্দ করে ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর মূর্তির নীচে স্থির হয়ে বসল। মুচুকুন্দ তাড়াতে যাচ্ছিলেন, মাতঙ্গী তাঁকে থামিয়ে চুপি চুপি বললেন, খবরদার, অমন কাজ ক'রো না, দেখছ না মা-লক্ষ্মীর বাহন এসেছেন। এই বলে তিনি গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন, তাঁর দেখাদেখি মুচুকুন্দও করলেন। পেঁচা মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে হুহু-হুম শব্দ করতে লাগল।

লক্ষ্মী পেঁচা তাতে সন্দেহ নেই, কারণ মুখটি সাদা, পিঠে সাদার উপর ঘোর খয়েরী রঙের ছিট। কাল পেঁচা নয়, কুটুরে পেঁচা নয়, হুতুমও নয়, যদিও আওয়াজ কতকটা সেই রকম। পেঁচার ডাক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। সংস্কৃতে বলে ঘূৎকার, ইংরেজীতে বলে হুট। শেকস্পীয়ার লিখেছেন, টু হুইট টু হু। মদনমোহন তর্কালংকার তাঁর শিশুশিক্ষায় লিখেছেন, ছোট ছেলের কান্নার মতন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কাল পেঁচা কুক-কুক-কুক অথবা করুণ শব্দ করে, কুটুরে পেঁচা কেচা-কেচা-কেচা রব করে, হুতুম পেঁচা হুউম হুউম করে। লক্ষ্মী পেঁচার বুলি তিনি লেখেন নি। মুচুকুন্দর গৃহাগত পেঁচাটির ডাক শুনে মনে হয় যেন দেওয়ালের ফুটো দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

মাতঙ্গী একটি রুপোর রেকাবিতে কিছু লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ রেখে পেঁচাকে নিবেদন করলেন। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে পেঁচা

একটু ক্ষীর আর ছানা খেলে, বাদাম পেস্তা আঙুর ছুঁলে না। মুচুকুন্দ বললেন, মাংসাশী প্রাণী, যদি পুষতে চাও তো আমিষ খাওয়াতে হবে। মাতঙ্গী বললেন, কাল থেকে মাগুর মাছ আর কচি পাঁঠার ব্যবস্থা করব।

পেঁচা মহা সমাদরে বাড়িতেই রয়ে গেল। মুচুকুন্দ তাকে কাকাতুয়ার মতন দাঁড়ে বসাবেন স্থির করে পায়ে রুপোর শিকল বাঁধতে গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন চিৎকার করে তাঁর হাতে ঠুকরে দিলে। তার পর থেকে সে যথেচ্ছাচারী মহামান্য কুটুম্বের মতন বাস করতে লাগল। লক্ষ্মীপুজোর ঘরেই সে সাধারণত থাকে, তবে মাঝে মাঝে অন্য ঘরেও যায় এবং রাত্রে অনেকক্ষণ বাইরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পালাবার চেষ্টা মোটেই করে না। বাড়ির চাকররা খুশী নয়, কারণ পেঁচা সব ঘর নোংরা করছে। মাতঙ্গী সবাইকে শাসিয়ে দিয়েছেন—খবরদার, পেঁচাবাবাকে যে গাল দেবে তাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।

পেঁচার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুচুকুন্দবাবুর কারবারের উন্নতি দেখা গেল। বার-তের বৎসর আগে তিনি তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই পঞ্চানন চৌধুরীর সঙ্গে কনট্রাকটারি আরম্ভ করেন। যুদ্ধ বাধলে এঁরা বিস্তর গরু ভেড়া ছাগল শুওর এবং চাল ডাল ঘি তেল ইত্যাদি সরবরাহের অর্ডার পান, তাতে বহু লক্ষ টাকা লাভও করেন। তার পর দুজনের ঝগড়া হয়, এখন পঞ্চানন আলাদা হয়ে শেঠ কৃপারাম কচালুর সঙ্গে কাজ করছেন। গত বৎসর মুচুকুন্দ মিলিটারি ঠিকাদারিতে সুবিধা করতে পারেন নি, কৃপারাম আর পঞ্চাননই সমস্ত বড় বড় অর্ডার বাগিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, পেঁচা আসবার পরদিনই মুচুকুন্দ টেলিগ্রাম পেলেন যে তাঁর দশ হাজার মন ঘিএর টেণ্ডারটি মঞ্জুর হয়েছে।

এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে মা-লক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং তাঁর বাহনটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যত দিন মুচুকুন্দ তার পক্ষ-পুটের আশ্রয়ে থাকবেন তত দিন কৃপারাম আর পঞ্চানন কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।

তিন দিন পরে কৃপারাম কচালু সকালবেলা মুচুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মুচুকুন্দ বললেন, আসুন আসুন শেঠজী, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলুম। হুকুম করুন কি করতে হবে।

কাষ্ঠ হাসি হেসে কৃপারাম বললেন, আপনাকে হুকুম করবার আমি কে বাবুসাহেব, আপনি হচ্ছেন কলকত্তা শহরের মাথা। আমি এসেছি একটি খবর জানতে। আপনার এখানে একটি উল্লু আছে?

মুচুকুন্দ বললেন, উল্লুক? একটি কেন, দুটি আছে, আমার ছেলে দুটোর কথা বলছেন তো?

—আরে রাম কহ। উল্লুক নয়, উল্লু, যাকে বলে পেঁচ।

—ইস্ক্রুপ? সে তো হার্ডওয়ারের দোকানে দেদার পাবেন।

—আঃ হা, সে পেঁচ নয় চিড়িয়া পেঁচ, তাকেই আমরা উল্লু বলি, রাত্রে চুপচাপ উড়ে বেড়ায়, চুহা কবুতর মেরে খায়।

—ও, পেঁচা! তাই বলুন। হাঁ, একটি পেঁচা কদিন থেকে এখানে দেখছি বটে।

কৃপারাম হাত জোড় করে বললেন, বাবুসাহেব, ওই পেঁচা আমার পোষা, শ্রীমতীজী—মানে আমার ঘরবালী—ওকে খুব পিয়ার

করেন। আপনি রেখে কি করবেন, আমার চিড়িয়া আমাকে দিয়ে দিন।

মুচুকুন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনার পোষা চিড়িয়া! তবে এখানে এল কি করে? পিঁজরায় রাখতেন না?

—ও পিঁজরায় থাকে না বাবুজী। এক বছর আগে আমার বাড়ির ছাতে এসেছিল, সেখানে একটা কবুতরকে মার ডাললে। আমি তাড়া করলে আমার কোঠির হাথায় যে আমগাছ আছে তাতে চড়ে বসল। সেখানেই থাকত, শ্রীমতীজী তাকে খানা দিতেন। সেখান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। এখন দয়া করে আমাকে দিয়ে দিন।

মুচুকুন্দবাবু সহাস্যে বললেন, শেঠজী, মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার জন্য এত লড়ছেন তবু এখনও আমরা ইংরেজের গোলাম হয়ে আছি। কিন্তু জংলী পাখি কারও গোলাম নয়। ওই পেঁচা মর্জি মাফিক কিছুদিন আপনার আমগাছে ছিল, এখন আমার বাড়িতে এসেছে। ও কারও পোষা নয়, স্বাধীন পক্ষী, আজাদ চিড়িয়া। দু দিন পরে হয়তো তেলারাম পিছলচাঁদের গদিতে যাবে, আবার সেখান থেকে আলিভাই সালেজীর কোঠিতে হাজির হবে। ও পেঁচার ওপর মায়া করবেন না।

কৃপারাম রেগে গিয়ে বললেন, আপনি ফিরত দিবেন না?

মুচুকুন্দ মধুর স্বরে উত্তর দিলেন, আমি ফেরত দেবার কে শেঠজী? মালিক তো পরমাৎমা, তিনিই তামাম জানোয়ারকে চালাচ্ছেন।

—তবে তো আদালতে যেতে হবে।

—তা যেতে পারেন। আদালত যদি বলে যে ওই জংলী পেঁচা আপনার সম্পত্তি তবে বেলিফ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবেন।

মুচুকুন্দ রায়ের বাড়ি থেকে পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়ি বেশী দূর নয়। কৃপারাম সেখানে উপস্থিত হলেন। পঞ্চানন বললেন, নমস্কার শেঠজী, অসময়ে কি মনে করে? খবর সব ভাল তো?

কৃপারাম বললেন, ভাল আর কোথা পঞ্চু ভাই, ঘিএর কনট্রাক্ট তো বিলকুল মুচুবাবু পেয়ে গেল। আমার বড় আশা ছিল যে কম-সে-কম চার লাখ মুনাফা হবে, আমার তিন লাখ তোমার এক লাখ থাকবে, তা হল না। এখন শুন পঞ্চুবাবু, তোমাকে একটি কাম করতে হবে। একটি উল্লু—তোমরা যাকে বল পেঁচা—আমার কোঠি থেকে পালিয়ে মুচুকুন্দবাবুর কোঠিতে গেছে। তিনি ফিরত দিতে চাচ্ছেন না। ছিনিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চানন বললেন, পেঁচায় আপনার কি দরকার?

—বহুত ভাল পেঁচা, আমার ঘরবালীর খুব পিয়াবেব পেঁচা। তাঁর এক বঙ্গালিন সহেলী আছেন, তিনি বলেছেন পেঁচাটি হচ্ছে লছমী মায়ীর সওয়ারি অসলী লক্ষ্মী পেঁচা। এই পেঁচাব আশীর্বাদেই তো পরসাল আমাদের কনট্রাক্ট মিলেছিল। আবার যেমনি সে মুচুকুন্দবাবুর কাছে গেল অমনি তিনি ঘিএর অর্ডার পেয়ে গেলেন।

—বটে! তা হলে তো পেঁচাটিকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনি মুচুকুন্দর নামে নালিশ ঠুকে দিন।

—নালিশে কিছু হবে না, পেঁচা তো পিঁজবায় ছিল না, আমাব কোঠির হাথায় আমগাছে থাকত। তুমি দুসরা মতলব কর, যেমন করে পার পেঁচাটিকে আমার কাছে পেঁছে দাও, খরচা যা লাগে আমি দিব।

পঞ্চানন একটু ভেবে বললেন, শক্ত কাজ, সময় লাগবে, হাজার দু-হাজার খরচও পড়তে পারে।

—খরচার জন্য ভেবো না, পেঁচা আমার চাই। কিন্তু দেরি করবে না, আবার তো এক মাসের মধ্যেই একটি বড় টেন্ডার দিতে হবে।

পঞ্চানন বললেন, আচ্ছা, আপনি ভাববেন না, যত শীঘ্র পারি পেঁচাটিকে আমি উদ্ধার করব।

মুচুকুন্দর বড় ছেলে লখা ছেলেবেলায় পঞ্চুকাকার খুব অনুগত ছিল, এখনও তাঁকে একটু খাতির করে। পঞ্চানন তার গতিবিধির খবর রাখেন, রাত নটায় যখন সে খাওয়ার পর বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরুচ্ছে তখন তাকে ধরলেন। লখাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে বললেন, বাবা লখু, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে, তার জন্যে অনেক টাকা পাবে। এই নাও, আগাম পঞ্চাশ টাকা এখনই দিচ্ছি, কাজ হাসিল হলে আরও দেব।

টাকা পকেটে পুরে লখা বললে, কি কাজ পঞ্চুকাকা?

পঞ্চানন লখার কাঁধে একটি আঙুল ঠেকিয়ে চোখ টিপে কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন, খুব লুকিয়ে কাজটি উদ্ধার করতে হবে বাবা, কেউ যেন টের না পায়।

—বাবার লোহার আলমারি ভাঙতে হবে?

—আরে না না। অমন অন্যায় কাজ আমি বলব কেন। তোমাদের বাড়িতে একটা পেঁচা আছে না? সেটা আমার চাই, চুপি চুপি ধরে আনতে হবে। যেন না চেঁচায়, তা হলে সবাই জেনে ফেলবে।

লখা বললে, মা বলে ওটা লক্ষ্মী পেঁচা, খুব পয়মন্ত। যদি অন্য পেঁচা ধরে এনে দিই তাতে চলবে না?

—উঁহু, ওই পেঁচাটিই দরকার। আমার গুরুদেব অঘোরী বাবা চেয়েছেন, কি এক তান্ত্রিক সাধনা করবেন। যে-সে পেঁচায় চলবে না, তোমাদের বাড়ির পেঁচাটিরই শাস্ত্রোক্ত সব লক্ষণ আছে। পারবে না লখু?

কিছুক্ষণ ভেবে লখা বললে, তা আমি পারব, কিন্তু দিন দশ-বার দেরি হবে, পেঁচাটাকে আগে বশ করতে হবে। এখন তো ব্যাটা আমাকে দেখলেই ঠোকরাতে আসে। কত টাকা দেবেন?

—পঞ্চাশ দিয়েছি, পেঁচা আনলে আরও পঞ্চাশ দেব।

—তাতে কিছুই হবে না, অন্তত আরও পাঁচ শ চাই। তা ছাড়া কোকেনের জন্য শ-খানিক। দারোয়ানটাকেও ঘুষ দিতে হবে, নইলে বাবাকে বলে দেবে।

—কোকেন কি হবে, তুমি খাও নাকি?

—রাম বল, ভদ্রলোকে কোকেন খায় না। আমার জন্যে নয়, ওই পেঁচাটাকে কোকেন ধরিয়ে বশ কবতে হবে, তবে তাকে আনতে পারব।

অনেক দর কষাকষির পর রফা হল যে পেঁচা পঞ্চাননের হস্তগত হলে লখা আরও আড়াই শ টাকা পাবে।

কপারাম নিজে এসে বা টেলিফোন করে রোজ খবর নিতে লাগলেন পেঁচা এল কিনা। পঞ্চানন তাঁকে বললেন, অত ব্যস্ত হবেন না, জানাজানি হয়ে যাবে। এলেই আপনাকে খবর দেব, আপনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।

দশ দিন পরে রাত এগারটার সময় লখা একটা রিক্‌শয় চড়ে পঞ্চাননের বাড়িতে এল। তার সঙ্গে একটি ঝুড়ি, কাপড় দিয়ে

মোড়া। পঞ্চানন অত্যন্ত খুশী হয়ে মাল সমেত লখাকে নিজের অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজায় খিল দিলেন। কাপড় সরিয়ে নিলে দেখা গেল পেঁচা বুঁদ হয়ে চুপ করে বসে আছে।

লখা বললে, শুনুন পঞ্চুকাকা, এটাকে দিনের বেলায় ঘরে বন্ধ করে রাখবেন, কিন্তু রাত্রে ছেড়ে দেবেন, ও ইঁদুর পাখির ছানা এইসব ধরে খাবে, নইলে বাঁচবে না। আর এই শিশিটা রাখুন, এতে পাঁচ শ ভাগ চিনির সঙ্গে এক ভাগ কোকেন মিশনো আছে। রোজ বিকেলে চারটের সময় পেঁচাকে অল্প এক চিমটি খেতে দেবেন। একটা ছোট রেকাবিতে রেখে নিজের হাতে ওর সামনে ধরবেন, তা হলেই খুঁটে খুঁটে খাবে। যেখানেই থাকুক রোজ মৌতাতের সময় ঠিক আপনার কাছে হাজির হবে।

পঞ্চানন মুগ্ধ হয়ে বললেন, উঃ, লখু তোমার কি বুদ্ধি বাবা! কোকেন ধরালে পেঁচা আর কারও বাড়ি যাবে না, কি বল?

লখা বললে, যাবার সাধ্য কি, ও চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।

বার দিন হয়ে গেল তবু পেঁচার কোনও খবর আসছে না দেখে কৃপারাম উদ্‌বিগ্ন হয়ে পঞ্চাননের বাড়ি এলেন। পঞ্চানন জানালেন, অনেক হাঙ্গামা আর খরচ করে তিনি পেঁচাটিকে হস্তগত করতে পেরেছেন।

কৃপারাম উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবা পঞ্চু ভাই! এনে দাও, এনে দাও, আমি এখনই মোটরে করে নিয়ে যাব। খরচ কত পড়েছে বল, আমি চেক লিখে দিচ্ছি।

পঞ্চানন একটু চুপ করে থেকে বললেন, খরচ বিস্তর লাগবে।

—কত? পাঁচ শ? হাজার?

—উঁহু, ঢের বেশী।

—বল না কত।

পঞ্চানন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শুনুন শেঠজী—লাখ পেঁচার মধ্যে একটি লক্ষ্মী পেঁচা মেলে, আবার দশ লাখ লক্ষ্মী পেঁচার মধ্যে একটি রাজলক্ষ্মী পেঁচা পাওয়া যায়। ইনি হলেন সেই আদত রাজলক্ষ্মী পেঁচা, সাত রাজার ধন এক মানিক। পঞ্চাশটি গণেশজীর চাইতে এঁর কুদরত বেশী। এমন ইনভেস্টমেণ্ট আর কোথাও পাবেন না, আপনার বাড়িতে থাকলে বহু লক্ষ টাকা আপনি কামাতে পারবেন, আমি তার ভাগ চাই না। আমাকে দশ লাখ নগদ দিন, আমি পেঁচা ডেলিভারি দেব।

কৃপারাম অত্যন্ত চটে গিয়ে বললেন, পঞ্চুবাবু, তুমি এত বড় বেইমান নিমকহারাম ঠক জুয়াচোর তা আমার মালুম ছিল না। দু হাজার টাকা নিয়ে পেঁচা দেবে কিনা বল, না দাও তো মুশকিলে পড়বে।

—আমার এক কথা, নগদ দশ লাখ চাই, ডেলিভারি এগেন্স্ট ক্যাশ। আপনি না দেন তো অন্য লোক দেবে, এই লড়াইএর বাজারে রাজলক্ষ্মী পেঁচার খদ্দের অনেক আছে।

কৃপারাম বললেন, আচ্ছা, তোমাকে আমি দেখে লিব। এই বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কৃপারাম তুখড় লোক। তিনি ভেবে দেখলেন, পঞ্চাননের কাছ থেকে পেঁচা চুরি করে আনলে ঝঞ্ঝাট মিটবে না, তাঁর বাড়ি থেকে আবার চুরি যেতে পারে। অতএব এক শত্রুর সঙ্গে রফা করে

আর এক শত্রুকে শায়েস্তা করতে হবে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তিনি মুচুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। মুচুকুন্দর মন ভাল নেই, তাঁর গৃহিণীও পেঁচার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

কৃপারাম বললেন, নমস্তে মুচুবাবু। আমার চিড়িয়া আপনি দিলেন না, জবরদস্তি ধরে রাখলেন, এখন দেখছেন তো, সে দুসরা জায়গায় গেছে।

মুচুকুন্দ ব্যগ্র হয়ে বললেন, আপনি জানেন নাকি কোথায় আছে?

—হাঁ, জানি। আপনার ভাই সেই পঞ্চু শালা চোরি করে নিয়ে গেছে, দশ লাখ টাকা না পেলে ছাড়বে না। মুচুবাবু, আমার কথা শুনুন, আমার সাথ দোস্তি করুন। ব্যাংক কটন-মিল ওগয়রহ আপনার থাকুক, আমি তার ভাগ চাই না, কেবল মিলিটারি ঠিকার কাজ আপনি আর আমি এক সাথ করব, মুনাফার বখরা আধাআধি। পঞ্চুর সঙ্গে আমার ফরাগত হয়ে গেছে। লক্ষ্মী পেঁচা পালা করে এক মাস আপনার কাছে এক মাস আমার কাছে থাকবে, তাহলে আর আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে না। বলুন, এতে রাজী আছেন?

মুচুকুন্দ বললেন, আগে পেঁচা উদ্ধার করুন।

—সে আপনি ভাববেন না, দু দিনের মধ্যে পেঁচা আপনার বাড়ি হাজির হবে। আমার মতলব শুনুন। ফজলু আর মিসরিলাল গুণ্ডাকে আমি লাগাব। তারা তাদের দলের লোক নিয়ে গিয়ে কাল দুপহর রাতে পঞ্চুর বাড়িতে ডাকাতি করবে, যত পারে লুঠ করবে, পঞ্চুকে ঐসা মার লাগাবে যে আর কখনও সে খাড়া হতে পারবে না।

—পেঁচার কি হবে?

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাছেই ছিপিয়ে থাকব, ফজলু আর মিসরিলাল আমার হাতেই পেঁচা দেবে।

মুচুকুন্দ বললেন, বেশ, আমি রাজী আছি। পেঁচা নিয়ে আসুন, আপনার সঙ্গে পাকা এগ্রিমেণ্ট করব।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ সাহেব করিমুল্লা মুচুকুন্দবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। রাত আটটার সময় তাঁর কাছে গিয়ে মুচুকুন্দ বললেন, খাঁ সাহেব, সুখবর আছে। কি খাওয়াবেন বলুন।

তেঁতুল-বিচির মতন দাঁত বার করে করিমুল্লা বললেন—তওবা! আপনি যে উলটো কথা বলছেন সার। পুলিস খাওয়ায় না, খায়।

মুচুকুন্দ বললেন, বেশ, আপনি আমার কাজ উদ্ধার করে দিন, আমিই আপনাকে খাওয়াব। এখন শুনুন—আমি খবর পেয়েছি, কাল দুপুর রাতে পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি হবে। পঞ্চুকে আপনি জানেন তো? দূর সম্পর্কে আমার ভাই হয়। ডাকাতের সর্দার হচ্ছেন স্বয়ং শেঠ কৃপারাম।

—বলেন কি, কৃপারাম কচালু?

—হাঁ, তিনিই। তাঁর সঙ্গে ফজলু আর মিসরিলালের দলও থাকবে। আপনি পঞ্চুর বাড়ির কাছাকাছি পুলিস মোতায়েন রাখবেন। ডাকাতির পরেই সবাইকে গ্রেপতার করে চালান দেবেন, মায় কৃপারাম। তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না, বরং ফজলু আর মিসরিকে ছাড়তে পারেন।

—ডাকাতির পরে গ্রেপতার কেন? আগে করাই তো ভাল।

—না না, তা হলে সব ভেস্তে যাবে। আর শুনুন—আমার একটি পেঁচা ছিল, পঞ্চু সেটাকে চুরি করেছে। আবার কৃপারাম পঞ্চুর ওপর বাটপাড়ি করতে যাচ্ছে। সেই পেঁচাটি আপনি আমাকে এনে দেবেন, কিন্তু যেন জখম না হয়।

—ও, তাই বলুন, পেঁচাই হচ্ছে বখেড়ার মূল! মেয়েমানুষ হলে বুঝতুম, পেঁচার ওপর আপনাদের এত খাহিশ কেন? কাবাব বানাবেন নাকি?

—এসব হিন্দুশাস্ত্রের কথা, আপনি বুঝবেন না। আমার কাজটি উদ্ধার করে দিন, সরকারের কাছে আপনার সুনাম হবে, খাঁ বাহাদুর খেতাব পেয়ে যাবেন, আমিও আপনার মান রাখব।

করিমুল্লার কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুচুকুন্দবাবু বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন রাত বারটার সময় পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়িতে ভীষণ ডাকাতি হল। নগদ টাকা আর গহনা সব লুট হয়ে গেল। পঞ্চাননের মাথায় আর পায়ে এমন চোট লাগল যে তিনি পনের দিন হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে রইলেন। তিনটে ডাকাত ধরা পড়ল, কিন্তু ফজলু আর মিসরিলাল পালিয়ে গেল। কৃপারাম পেঁচার খাঁচা নিয়ে একটা গলি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছিলেন, তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। সকালবেলা স্বয়ং খাঁ সাহেব করিমুল্লা মুচুকুন্দর হাতে পেঁচা সমর্পণ করলেন। মাতঙ্গী দেবী শাঁক বাজিয়ে লক্ষ্মীর বাহনকে ঘরে তুললেন।

পেঁচা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে, কিন্তু তার ফূর্তি নেই। সমস্ত দিন সে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। নিশ্চিন্ত হবার জন্য পঞ্চানন তাকে ডবল মাত্রা খাওয়াচ্ছিলেন, তাই বেচারা ঝিমিয়ে আছে। বিকালবেলা মৌতাতের সময় সে ছটফট করতে লাগল, মুচুকুন্দ কাছে এলে তাঁর হাতে ঠুকরে দিলে। মাতঙ্গী আদর করে বললেন, কি হয়েছে কি হয়েছে আমার পেঁচু বাপধনের! পেঁচা তাঁর হাতে ঠোকর

মেরে গালে নখ দিয়ে আঁচড়ে রক্তপাত করে দিলে। মাতঙ্গী রাগ সামলাতে পারলেন না, দূর হ লক্ষ্মীছাড়া বলে তাকে হাত-পাখা দিয়ে মারলেন। পেঁচা বিকট চ্যাঁ চ্যাঁ রব করে ঘর থেকে উড়ে কোথায় চলে গেল। মাতঙ্গী ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে লোক পাঠালেন, কিন্তু পেঁচার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনাবলী খুব দ্রুত। মুচুকুন্দর উত্থান গত পনের বৎসরে ধীরে ধীরে হয়েছিল, কিন্তু এখন ঝুপ করে তাঁর পতন হল। কিছুকাল থেকে ফটকাবাজিতে তাঁর খুব লোকসান হচ্ছিল। সম্প্রতি তিনি যে দশ হাজার মন ঘি পাঠিয়েছিলেন, ভেজাল প্রমাণ হওয়ায় তার জন্য বিস্তর টাকা গচ্চা দিতে হল। তাঁর মুরুব্বী মেজর রবসন হঠাৎ বদলী হওয়াতেই এই বিপদ হল, তিনি থাকলে অতি রাবিশ মালও পাস করে দিতেন। মুচুকুন্দবাবুর কম্পানি-গুলোরও গতিক ভাল নয়। এমন অবস্থায় ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা যা করে থাকেন তিনিও তাই কবলেন, অর্থাৎ এক কারবারের তহবিল থেকে টাকা সরিয়ে অন্য কারবার ঠেকিয়ে রাখতে গেলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁর পিছনে লাগল। তার পর একদিন তাঁর ব্যাঙ্কের দরজায় তালা পড়ল, যথারীতি পুলিসের তদন্ত এবং খাতাপত্র পরীক্ষা হল, এক বৎসর ধরে মকদ্দমা চলল, পরিশেষে মুচুকুন্দ তহবিল-তছরুপ জালিয়াতি ফেরেববাজি প্রভৃতির দায়ে জেলে গেলেন।

মাতঙ্গী দেবী তাঁর ভাই তারাপদর কাছে আশ্রয় নিলেন। লখা আর সরা কোথায় থাকে কি করে তার স্থিরতা নেই। তারাপদবাবু বলেন, দিদি আর জামাইবাবু মস্ত ভুল করেছিলেন। পেঁচাটা লক্ষ্মীপেঁচাই নয়, নিশ্চয় হুতুমপেঁচা, ভোল ফিরিয়ে এসেছিল।

সেই অলক্ষ্মীর বাহনই সর্বনাশ করে গেল। তারাপদ দিল্লি থেকে খবর পেয়েছেন যে সেই পেঁচা এখন কিং এডোআর্ড রোডের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে একটা পেঁচীও জুটেছে, কোথায় আস্তানা গাড়বে বলা যায় না।

১৩৫৮

অক্রূরসংবাদ

নমস্কার মশাই। আপনার পাশে একটু বসবার জায়গা হবে কি? ঢাকুরে লেকের ধারে একটা বেঞ্চে একলা বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে ওঠবার উপক্রম করছি এমন সময় আগন্তুক ভদ্রলোকটি উক্ত প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিলুম, নিশ্চয় নিশ্চয়, বসবেন বই কি, ঢের জায়গা রয়েছে।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, লম্বা রোগা ফরসা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সযত্নে সিঁথি-কাটা, মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতন গোঁফ-দাড়ি। পরনে মিহি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি, হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। দেখলেই মনে হয় সেকেলে শৌখিন বড়লোক। পকেট থেকে একটা বড় কাগজ বার করে বেঞ্চের এক পাশে বিছিয়ে তার ওপর বসে পড়ে বললেন, আমি হচ্ছি অক্রূর নন্দী। মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

আমি বললুম, নিশ্চয় পারেন, আমার নাম সুশীলচন্দ্র চন্দ্র।

আপনার কি বাড়ি ফেরবার তাড়া আছে? না থাকে তো খানিক ক্ষণ বসুন না, আলাপ করা যাক। দেখুন, আমি হচ্ছি একটু খাপছাড়া ধরনের, লোকের সঙ্গে সহজে মিশতে পারি না, যার তার সঙ্গে বনেও না।

আমি হেসে প্রশ্ন করলুম, তবে আমার সঙ্গে আলাপ কবতে চাচ্ছেন কেন? যদি না বনে?

অক্রূর নন্দী ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারি। আপনার বয়স চল্লিশের নীচে, কি বলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তা হলে বনবে। বুড়োদের সঙ্গে আমার মোটেই বনে না, তাদের হাড় চামড়া মন সব শুখিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ভাবছেন লোকটা বলে কি, নিজেও তো বুড়ো। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু আমার মন শুখিয়ে যায় নি।

—অর্থাৎ আপনি এখনও তরুণ আছেন।

অক্রূরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তরুণ ফরুন নই। আমি হচ্ছি একজন বোদ্ধা অর্থাৎ ফিলসফার, জগৎটাকে হ্যাংলা বোকার মতন গবগব করে গিলতে চাই না, চেখে চেখে চিবিয়ে চিবিয়ে ভোগ করতে চাই। চলুন না আমার বাড়ি, খুব কাছেই। রাত্রের খাবারটা আমার সঙ্গেই খাবেন, আমার জীবনদর্শনও আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোল আছে তাতে সন্দেহ নেই। বললুম, আজ তো বাড়িতে বলে আসি নি, ফিরতে দেরি হলে সবাই ভাববে যে।

—বেশ, কাল এই সময় এখানে আসবেন, আমি আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব, সেখানেই আহার করবেন। ভাবছেন লোকটা আবুহোসেন নাকি? কতকটা তাই বটে। একা একা থাকি, কথা কইবার উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বেড়াই, কিন্তু লাখে একজনও মেলে না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনিও একজন বোদ্ধা। কি করা হয়?

—কলেজে ফিলসফি পড়াই।

—বাহা বাহা! তবেই দেখুন আমি কি রকম মানুষ চিনতে পারি।

সবিনয়ে বললুম, যা ভাবছেন তা নই, আমার বিদ্যা বুদ্ধি অতি সামান্য। পুরুত যেমন করে যজমানদের মন্ত্র পড়ায় আমিও তেমনি

করে ছাত্রদের পড়াই। নিজেও কিছু বুঝি না, তারাও কিছু বোঝে না।

—ও কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আচ্ছা, এখন আলোচনা থাক, আপনি বোধ হয় ওঠবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাল ঠিক আসবেন তো?

অক্রুর নন্দী বাতিকগ্রস্ত বটে, কিন্তু শেকস্পীয়ার যেমন বলেছেন—এ'র পাগলামিতে শৃঙখলা আছে। লোকটিকে ভাল করে জানবার জন্য খুব কৌতূহল হল। বললুম, আজ্ঞে হাঁ, ঠিক আসব।

পরদিন যথাকালে উপস্থিত হয়ে দেখলুম অক্রুরবাবু বেঞ্চে বসে আছেন। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আসুন আসুন সুশীলবাবু। এখানে সময় নষ্ট করে কি হবে, আমার বাড়ি চলুন। খুব কাছেই, এই সাদার্ন অ্যাভিনিউএর পাশ থেকে বেরিয়েছে হর্ষবর্ধন রোড, তারই দশ নম্বর হচ্ছে আমার বাড়ি।

যেতে যেতে আমি বললুম, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—মশায়ের কি করা হয়?

অক্রুরবাবু প্রতিপ্রশ্ন করলেন, আপনি আত্মা মানেন?

—বড় কঠিন প্রশ্ন। আমার একটা আত্মা জন্মাবধি আছে বটে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলেও যাচ্ছে, কিন্তু জন্মের আগেও সেই আত্মাটা ছিল কিনা তা তো জানি না।

—ও, আপনি হচ্ছেন অজ্ঞাবাদী অ্যাগ্‌নস্টিক। আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি জন্মান্তরীণ আত্মা মানি। আমার গত জন্মের আত্মাটি খুব চালাক ছিল মশাই, বেছে বেছে বড়লোকের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে।

—আপনি ভাগ্যবান লোক।

—তা বলতে পারেন। বাবা এত টাকা রেখে গেছেন যে রোজগারের কোনও দরকারই নেই। অন্নচিন্তা থাকলে উচ্চচিন্তা করতে পারতুম না। আমি বেকার অলস লোক নই, দিনরাত গবেষণা করি কিসে মানুষের বুদ্ধি বাড়বে, সমাজের সংস্কার হবে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? আমি অন্তত দু শ বৎসর আগে জন্মেছি, এখনকার লোকে আমার থিওরি বুঝতেই পারে না।

—আমিই যে বুঝব সে ভরসা করছেন কেন?

—বুঝবেন, একটু চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আপনার দুই কানের ওপরে একটু ঢিপি মতন আছে, ওই হল বোদ্ধার লক্ষণ। আসুন, এই আমার আস্তানা অক্রূরধাম। পৈতৃক বাড়িটি কাকারা পেয়েছেন, এ বাড়ি আমি করেছি।

অক্রূরধাম বিশেষ বড় নয় কিন্তু গড়ন ভাল। বারান্দায় চার-পাঁচ জন দারোয়ান চাকর ইত্যাদি একটা বেঞ্চে বসে গল্প করছিল, মনিবকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। অক্রূরবাবু হাতের ইশারায় তাদের বসতে বলে আমাকে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি মাঝারি, আসবাব অল্প, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন।

ঘরে ঢোকবার সময় দরজার পাশের দেওয়ালে আমার হাত ঠেকে গিয়েছিল। দেখলুম একটু আঁচড়ে গেছে। অক্রূরবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন, খোঁচা খেয়েছেন বুঝি? ভয় নেই, ওষুধ দিচ্ছি। এই বলে তিনি আমার হাতে বেগনী কালির মতন কি একটা লাগিয়ে দিলেন।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, ও কিছুই নয়, একটু ছড়ে গেছে। বোধ হয় ওখানে একটা পেরেক আছে।

—একটা নয় মশাই, সারি সারি পিন বসানো আছে, হাত দিলেই

ফুটবে। কেন লাগাতে হয়েছে জানেন? ভারতবর্ষ হচ্ছে বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরারীর দেশ। এখানকার লোকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, চাকর ধোবা গোয়ালা নাপিত যেই হক—এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকও—দরজায় বা দেওয়ালে হাতের ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সেই শ্রীকৃষ্ণের আমল থেকে চলে আসছে, অজণ্টার ছবিতে আর পুরী মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতির মন্দিরে একটাও সোজা মূর্তি পাবেন না। বাড়ির চাকর আর আগন্তুক লোকদের গা-হাত লেগে দেওয়াল আর দরজা ময়লা হয়, কিছুতেই কদভ্যাস ছাড়াতে পারি না। নিরুপায় হয়ে মেঝে থেকে এক ফুট বাদ দিয়ে দেওয়াল আর দরজার ছ ফুট পর্যন্ত, মায় সিঁড়ির রেলিংএ সারি সারি গ্রামোফোন পিন লাগিয়েছি, প্রায় দু লক্ষ পিন। এখন আর বাছাধনরা অজণ্টা প্যাটার্ন ত্রিভঙ্গ হয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসতেও পারে না।

—বাড়িতে চাকর টিকে থাকে কি করে?

—মাইনে আড়াইগুণ করে দিয়েছি। কেউ কেউ ভুলে ঠেস দিয়ে জখম হয়, তাই এক বোতল জেনশ্যান ভায়োলেট লোশন রেখেছি। খুব ভাল অ্যাণ্টিসেপটিক, আর দাগটাও তিন-চার দিন থাকে, তা দেখে লোকে সাবধান হয়।

—কিন্তু বাচ্চাদের সামলান কি করে? বাড়িতে ছেলেপিলে আছে তো?

অট্টহাস্য করে অক্রূরবাবু বললেন, ছেলে হচ্ছি আমি, আর পিলে ওই চাকরগুলো।

—সেকি, আপনার সন্তানাদি নেই?

—দেখুন সুশীলবাবু, বিবাহ করব না অথচ সন্তানের জন্ম দেব এমন আহাম্মক আমি নই।

—কেন, বিবাহ করেন নি?

—চেষ্টা ঢের করেছি, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।

—আপনার মতন লোকের এ পর্যন্ত পত্নীলাভ হয় নি এ বড় আশ্চর্য কথা। আপনি ধনী, সুপুরুষ, সুশিক্ষিত জ্ঞানী—

—আমার আরও অনেক গুণ আছে। নেশা করি না, পান তামাক চা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য স্পর্শ করি না, মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি আমার রান্নাঘরে ঢুকতে পায় না। আমি গান্ধীজীর থিওরি মানি, তরকারির খোসা বাদ দেওয়া আর মসলা দিয়ে রাঁধা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি রশুন খেতেন, আমি তাও খাই না। নুনও খুব কমিয়ে দিয়েছি, তাতে ব্লাড-প্রেশার বাড়ে।

—দুধ খান তো?

—তা খাই, কিন্তু বাছুরকে বঞ্চিত করি না। বাড়িতে তিনটে গরু আছে, বাছুরের জন্য যথেষ্ট দুধ রেখে বাকীটা নিজে খাই।

অক্রূরবাবুর কথা শুনে বুঝলুম আজ রাত্রে আমার কপালে উপবাস আছে। মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে সাইনবোর্ড দেখেছি —ঔদরিক এম্পোরিয়ম। ফেরবার সময় সেখানেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে।

অক্রূরবাবু বললেন, ও ঘরে চলুন, খেতে খেতেই আলাপ করা যাবে। শাস্ত্রে বলে, মৌনী হয়ে খাবে। তা আমি মানি না, বিলিতী পদ্ধতিতে গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে খেলেই ভাল হজম হয়।

খাবার এল। অক্রূর নন্দী খেয়ালী লোক হলেও তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে, আমার জন্য ভাল ভাল খাবারেরই আয়োজন করেছেন। কিন্তু

তাঁর নিজের জন্য এল খান কতক মোটা রুটি, কিছু সিদ্ধ তরকারি, কিছু কাঁচা তরকারি, আর এক বাটি দুধ।

অক্রূরবাবু বললেন, কোনও জন্তু ক্যালরি প্রোটিন ভাইটামিন নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষরা জন্তুর মতনই কাঁচা জিনিস খেতেন, তাতেই তাঁদের পুষ্টি হত। সভ্য হয়ে সেই সদভ্যাস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন কাঁচা লাউ কুমড়ো অনেকেই হজম করতে পারে না, তাই আপনাকে দিই নি। আমি কিন্তু কাঁচা খাওয়া অভ্যাস করেছি, একটু একটু করে ঘাস খেতেও শিখছি। যাক ও কথা। আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা প্রশ্ন আপনার কণ্ঠাগত হয়ে আছে। চক্ষুলজ্জা করবেন না, অসংকোচে বলে ফেলুন।

আমি বললুম, কিছু যদি মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—আপনি বলেছেন যে বিবাহের জন্য ঢের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। কেন হয়ে ওঠে নি বলবেন কি?

—আরে সেই কথা বলতেই তো আপনাকে ডেকে এনেছি। শুনুন। দাম্পত্য হচ্ছে তিন রকম। এক নম্বর, যাতে স্বামীর বশে স্ত্রী চলে, যেমন গান্ধী-কস্তুরবা। দু নম্বর, যাতে স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর বশ, অর্থাৎ স্ত্রৈণ ভেড়ো বা হেনপেক, যেমন জাহাঙ্গির-নুরজাহান। দুটোই হল ডিক্টেটারী ব্যবস্থা, কিন্তু দুক্ষেত্রেই দম্পতি সুখী হয়। তিন নম্বর হচ্ছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী কিছুমাত্র রফা না করে নিজের নিজের মতে চলে, অর্থাৎ দুজনেই একগুঁয়ে। এই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক আদর্শ দাম্পত্য-সম্বন্ধ, কিন্তু এর পদ্ধতি বা টেকনিক লোকে এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি।

—আপনি নিজে কি রকম দাম্পত্য পছন্দ করেন?

—তিন রকমেরই চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনওটাই

অবলম্বন করতে পারি নি। তারই ইতিহাস আপনাকে বলব। যখন বয়স কম ছিল তখন আর পাঁচ জনের মতন এক নম্বর দাম্পত্যই পছন্দ করতুম। যেমন বাঁদর ষাঁড় ছাগল মোরগ প্রভৃতি জন্তু, তেমনি মানুষেরও পুংজাতি সাধারণত প্রবল, তারাই স্ত্রীজাতিকে শাসন করতে চায়। কিন্তু মুশকিল কি হল জানেন? কাকেও পীড়ন করা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু আমার সংসারযাত্রার আদর্শ এত বেশী র‍্যাশন্যাল যে কোনও স্ত্রীলোকই তা বরদাস্ত করতে পারে না।

—পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলুম বইকি। আমার বয়স যখন চব্বিশ তখন আমার মেজকাকী তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনঝির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করলেন। আমাদের সমাজে কোর্টশিপের চলন তখনও হয় নি, অভিভাবকরাই সম্বন্ধ স্থির করতেন। আমার বাপ-মা তখন গত হয়েছেন, কাকাদের সঙ্গেই থাকতুম। আমি মেজকাকীকে বললুম, বিয়েতে মত দেবার আগে তোমার বোনঝিকে আমার মনের কথা জানাতে চাই। কাকী বললেন, বেশ তো, যত খুশি জানিও, আমি না হয় আড়ালে থাকব। তার পর এক দিন মেয়েটিকে আনা হল। আমি তাকে একটি লেকচার দিলুম।—শোন উজ্জ্বলা, আমি স্পষ্ট-বক্তা লোক, আমার কথায় কিছু মনে ক'রো না যেন। তুমি দেখতে ভালই, ম্যাট্রিক পাস করেছ, শুনেছি গান বাজনা আর গৃহকর্মও জান। ওতেই আমি তুষ্ট। তুমিও আমাকে বিয়ে করলে ঠকবে না, একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ বিদ্বান ধনবান আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান স্বামী পাবে, আমার নতুন বাড়ির সর্বেসর্বা গিন্নী হবে, বিস্তর টাকা খরচ করতে পাবে। কিন্তু তোমাকে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে। দু-এক গাছা চুড়ি ছাড়া গহনা পরতে পাবে না, শৃঙ্গী নখী আর দন্তী প্রাণীর মতন সালংকারা স্ত্রীও ডেঞ্জারস। নিমন্ত্রণ গিয়ে

যদি নিজের ঐশ্বর্য জাহির করতে চাও তো ব্যাঙ্কের একটা সার্টি-ফিকেট গলায় ঝুলিয়ে যেতে পার। সাজগোজেও অন্য মেয়ের নকল করবে না, আমি যেমন বলব সেইরকম সাজবে। আর শোন—ছবি টাঙিয়ে দেওয়াল নোংরা করবে না, নতুন নতুন জিনিস আর গল্পের বই কিনে বাড়ির জঞ্জাল বাড়াবে না, গ্রামোফোন আর রেডিও রাখবে না। ইলিশ মাছ কাঁকড়া পেঁয়াজ পেয়ারা আম কাঁঠাল ত্যাগ করতে হবে, ওসবের গন্ধ আমার সয় না। পান খাবে না, রক্তদন্তী স্ত্রী আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। সাবান যত খুশি মাখবে, কিন্তু এসেন্স পাউডার নয়, ওসব হল ফিনাইল জাতীয় জিনিস, দুর্গন্ধ চাপা দেবার অসাধু উপায়। এই রকম আরও অনেক বিধিনিষেধের কথা জানিয়ে তাকে বললুম, তুমি বেশ করে ভেবে দেখ, তোমার বাপ-মার সঙ্গে পরামর্শ কর, যদি আমার শর্ত মানতে পার তবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে খবর দিও। কিন্তু এক হপ্তা হয়ে গেল, তবু কোনও খবর এল না।

—বলেন কি!

—অবশেষে আমিই মেজকাকীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? তিনি পাত্রীর বাড়িতে তাগাদা পাঠালেন। তার পর আমি একটা পোস্টকার্ড পেলুম। পাত্রীর দাদা ইংরিজীতে লিখেছে—গো টু হেল।

—কন্যাপক্ষ দেখছি অত্যন্ত বোকা, আপনার মতন বরের মূল্য বুঝল না।

—হাঁ, বেশীর ভাগই ওই রকম বোকা, তবে গোটাকতক চালাক কন্যাপক্ষও জুটেছিল। তাদের মতলব, ভাঁওতা দিয়ে আমার ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দেওয়া। তখন একটা নতুন শর্ত জুড়ে দিলুম—ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে তখনই তাকে

বিদেয় করব। খোরপোশ দেব, কিন্তু আমার সম্পত্তি সে পাবে না। এই কথা শুনে সব ভেগে পড়ল। জ্ঞাতিশত্রুরাও রটাতে লাগল যে আমি একটা উন্মাদ। কিন্তু একটি মেয়ে সত্যিই রাজী হয়েছিল। অত্যন্ত গরিবের মেয়ে, দেখতেও তেমন ভাল নয়। আমার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে তখনই বললে যে সে রাজী। আমি বললুম, অত তাড়াতাড়ি নয়, তোমার বাপ মায়ের মত নিয়ে জানিও। পরদিন খবর এল বাপ-মাও খুব রাজী। আমার সন্দেহ হল। খোঁজ নিয়ে জানলুম, রূপ আর টাকার অভাবে তার পাত্র জুটছে না। বাপ মা অত্যন্ত সেকেলে, মেয়েকে কেবল অভিশাপ দেয়। এখন সে শরৎ চাটুজ্যেব অরক্ষণীয়ার মতন মরিয়া হয়ে উঠেছে, নির্বিচারে যার-তার কাছে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত। মেয়ের বাপের সংগে দেখা করে আমি বললুম, আপনার মেয়ে শুধু আপনাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, আমার শর্তগুলো মোটেই বিচার করে দেখে নি। এমন বিয়ে হতে পারে না। এই নিন পাঁচ হাজার টাকা, আমি যৌতুক দিলুম, মেয়েকে আপনাদের পছন্দ মত ঘরে বিয়ে দিন। বাপ খুব কৃতজ্ঞ হয়ে বললে, আপনিই খুকীর যথার্থ পিতা, আমি জন্মদাতা মাত্র। মেয়েটি ভাল ঘরেই পড়েছিল, বিয়ের পর বরেব সংগে আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল।

আমি বললুম, আপনি মহাপ্রাণ দয়ালু ব্যক্তি।

—তা মাঝে মাঝে দয়ালু হতে হয়, টাকা থাকলে দান করায় বাহাদুরি কিছু নেই। তার পর শুনুন। আমার বয়স বেড়ে চলল, পঁয়ত্রিশ পার হয়ে বুঝলুম আমার আদর্শের সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে এমন কৃচ্ছ্রসাধিকা নারী কেউ নেই। তখন আমার একটা মানসিক বিপ্লব হল, যাকে বলে রিভল্যুশন। এক নম্বর

দাম্পত্য যখন হবার নয় তখন দু নম্বরের চেষ্টা করলে দোষ কি? আমার অনেক আত্মীয় তো স্ত্রীর বশে বেশ সুখে আছে। স্ত্রৈণতাও সংসারযাত্রার একটি মার্গ। জগতে কর্তাভজা বিস্তর আছে, তারা বিচারের ভার কর্তার ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। যা করেন গুরুমহারাজ, যা করেন পণ্ডিতজী, যা করেন কমরেড স্তালিন আর মাও-সে-তুং। তেমনি গিন্নীভজাও অনেক আছে। তারা বলে, আমার মতামতের দরকার কি, যা করেন গিন্নী।

—কিন্তু আপনার স্বভাব যে অন্য রকম, আপনার পক্ষে গিন্নী-ভজা হওয়া অসম্ভব।

—অবস্থাগতিকে বা সাধনার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। একটি সার সত্য আপনাকে বলছি শুনুন। যে নারী রাজার রানী হয়, বড়-লোকের স্ত্রী হয়, নামজাদা গুণী লোকের গৃহিণী হয়, সে নিজেকে মহাভাগ্যবতী মনে করে, অনেক সময় অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু রানীকে বা টাকাওয়ালী মেয়েকে যে বিয়ে করে, কিংবা যার স্ত্রী মস্ত বড় দেশনেত্রী লেখিকা গায়িকা বা নটী, এমন পুরুষ প্রথম প্রথম খুব সংকুচিত হয়ে থাকে। সে স্বনামধন্য নয়, স্ত্রীর নামেই তার পরিচয়, লোকে তাকে একটু অবজ্ঞা করে। কিন্তু কালক্রমে তার সয়ে যায়, ক্ষোভ দূর হয়, সে খাঁটী স্ত্রৈণ হয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে।

—আপনিও সে রকম হতে চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

—করেছিলুম। কুইন ভিক্টোরিয়া, সারা বার্নহার্ড, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বা সরোজিনী নাইডুর মতন পত্নী যোগাড় করা অবশ্য আমার সাধ্য নয়, কিন্তু যদি একজন বেশ জবরদস্ত নামজাদা মহিলার কাছে চোখ কান বুজে আত্মসমর্পণ করতে পারি তবে হয়তো দু নম্বর

দাম্পত্যও আমার সয়ে যেতে পারে, আমার মত আর আদর্শও বদলে যেতে পারে।

—আপনার পক্ষে তা অসম্ভব মনে করি।

—আমি কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তখন আমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, পুরীতে স্বর্গদ্বারের পূব দিকে নিজের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, ওশন-ভিউ হোটেলে আছি। আমার পুরনো সহপাঠী ভূপেন সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন মস্ত গভর্নমেণ্ট অফিসার, ছুটি নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আছে তার বোন সত্যভামা সরকার। দুজনে আমার হোটেলেই উঠল। সত্যভামা বিখ্যাত মহিলা, দু বার বিলাত ঘুরে এসেছে, হুণ্ডাগড়ের রানী সাহেবাকে ইংরিজী পড়ায় আর আদব কায়দা শেখায়, অনেক বইও লিখেছে। নাম আগেই শোনা ছিল, এখন আলাপ হল। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দশাসই চেহারা, মুখটি গোবদা গোছের, ড্যাবডেবে চোখ, নীচের ঠোঁট একটু বাইরে ঠেলে আছে। দেখলেই বোঝা যায় যে ইনি একজন জবরদস্ত মহীয়সী মহিলা, স্বামীকে বশে রাখবার শক্তি এঁর আছে। ভাবলুম, এই সত্যভামার কাছেই আত্ম-সমর্পণ করলে ক্ষতি কি। দু দিন মিশেই বুঝলুম, আমি যেমন তাকে বাজিয়ে দেখছি, সেও তেমনি আমাকে দেখছে।

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন শিকার কাহিনী শুনছি।

—কতকটা সেই রকমই বটে। যেন একটা বাঘিনী ওত পেতে আছে, আর একটা বাঘ তার পিছনে ঘুরছে। তার পর একদিন আমার নতুন বাড়ি তদারক করতে গেছি, ভূপেন আর সত্যভামাও সঙ্গে আছে। সত্যভামা বললে, জানেন তো, সমস্ত ইট বেশ করে ভিজিয়ে নেওয়া চাই, আর ঠিক তিন ভাগ সুরকির সঙ্গে এক ভাগ চুন মেশানো চাই, নয়তো গাঁথুনি মজবুত হবে না। আমার একটু

রাগ হল। সাতটা বাড়ি আমি নিজে তৈরি করিয়েছি, কোনও ওভারশিয়ারের চাইতে আমার জ্ঞান কম নয়, আর আজ এই সত্যভামা আমাকে শেখাতে এসেছে!

—আপনার কিন্তু রাগ হওয়া অন্যায়, আপনি তো আত্মসমর্পণ করতেই চেয়েছিলেন। দু নম্বর দাম্পত্যে স্বামীকে স্ত্রীর উপদেশ শুনতেই হয়।

—তা ঠিক, কিন্তু হঠাৎ অনভ্যস্ত উপদেশ একটু অসহ্য বোধ হয়েছিল। তখনকার মতন সামলে নিলুম, কিন্তু পরে আবার গোল বাধল। রাত্রে হোটেলে এক টেবিলে খেতে বসেছি। সত্যভামা বললে, দেখুন মিস্টার নন্দী, আপনার খাওয়া মোটেই সায়েণ্টিফিক নয়, মাছ মাংস ডিম টোমাটো ক্যারট লেটিস এইসব খাওয়া দরকার, যা খাচ্ছেন তাতে ভাইটামিন কিচ্ছু নেই। এবারে আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। ক্যালরি প্রোটিন অ্যামিনোঅ্যাসিড আর ভাইটামিনের হাড় হদ্দ আমার জানা আছে, তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি গুলে খেয়েছি, আর এই মাষ্টারনী আমাকে লেকচার দিচ্ছে! রাগের বশে একটা অসত্য কথা বলে ফেললুম—দেখুন মিস সত্যভামা, ভাইটামিন আমার সয় না। সত্যভামা বললে, সয় না কি রকম! উত্তর দিলুম, না, একদম সয় না, ডাক্তার বারণ করেছে। সত্যভামা ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে গেল।

—আপনার ধৈর্য দেখছি বড়ই কম।

—সেই তো হয়েছে বিপদ, উপদেশ আমার বরদাস্ত হয় না। তার চার দিন পরে যা হল একবারে চূড়ান্ত। বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছি, শুধু আমি আর সত্যভামা, ভূপেন বোধ হয় ইচ্ছে করেই আসে নি। সত্যভামা হঠাৎ বললে, ওহে অক্রূর, তুমি গোঁফ-দাড়িটা কালই কামিয়ে ফেল, ওতে তোমাকে মানায় না,

জংলী জংলী মনে হয়। কি আস্পর্ধা দেখুন! যার ছাগল-দাড়ি বা ইঁদুরে খাওয়ার মতন বিশ্রী দাড়ি তার অবশ্য না রাখাই উচিত। কিন্তু আমার মতন যার সুন্দর নিরেট দাড়ি সে কামাবে কোন্ দুঃখে? সত্যভামার কথায় আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। কোটি কোটি বৎসর ধরে পুরুষত্বের যে বীজ প্রাণিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে এসেছে, যার প্রভাবে সিংহের কেশর, ষাঁড়ের ঝুঁটি, ময়ূরের পেখম আর মানুষের দাড়ি-গোঁফ উদ্ভূত হয়েছে, সেই দুর্দান্ত পুং-হরমোন আমার রক্তে মাংসে মজ্জায় কুপিত হয়ে উঠল, আমি ধমক দিয়ে বললুম, চোপ রও, ও কথা মুখে আনবে না, কামাতে চাও তো নিজের মাথা মুড়িয়ে ফেল। সত্যভামা একবার আমার দিকে কটকট করে তাকাল, তার পর উঠে চলে গেল। রাত্রে খাবার সময় ভাই বোন কাকেও দেখলুম না। পরদিন সকালের ট্রেনে আমি কলকাতায় রওনা হলুম।

—তার পর আর কোথাও দু নম্বর দাম্পত্যের চেষ্টা করেছিলেন?

—রাম বল, আবার! বুঝতে পারলুম, এক নম্বর দু নম্বর কোনওটাই আমার ধাতে সইবে না। তার পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম, দাম্পত্যের তিন নম্বরও আছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী নিজের নিজের মতে চলে অথচ সংঘর্ষ হয় না। আবিষ্কারটা ঠিক আমি করি নি, রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন—

—বলেন কি?

—হাঁ, রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন। কিন্তু লোকে তার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, তাঁর লেখা থেকে আমিই পুনরাবিষ্কার করেছি। তিনি কি লিখেছেন শুনতে চান?

অক্রূরবাবু পাশের ঘর থেকে 'শেষের কবিতা' এনে পড়তে লাগলেন।—

অমিত রায় লাবণ্যকে বলছে—ওপারে তোমার বাড়ি, এপারে আমার।...একটি দীপ আমার বাড়ির চূড়ায় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল।...অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনো মতেই যেতে পাব না।... তোমার নিমন্ত্রণ মাসে এক দিন পূর্ণিমার রাতে।...পূজোব সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দু জনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দু জনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে। এই তো আমার দাম্পত্যের স্বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। তোমার কি মত? লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—মেনে নিতে রাজী আছি।...আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমাব দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেই জন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।...তার পর লাবণ্য প্রশ্ন করছে—কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে? টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, থাকবে থাকবে থাকবে।

আমি বললুম, অমিত রায় হচ্ছে একটি কথার তুবড়ি। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে তাকে দিয়ে যা বলিয়েছেন আপনি তা সত্য মনে করছেন কেন?

অক্রূরবাবু টেবিলে কিল মেরে বললেন, মোটেই পরিহাস নয়, একবারে খাঁটী সত্য। তিনি সর্বদর্শী কবি ছিলেন, দাম্পত্যের যা পরাকাষ্ঠা সেই তিন নম্বরেরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তার ভাবার্থ হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা বাড়িতে বাস করবে, কালেভদ্রে দেখা করবে, তবেই তাদের প্রীতি স্থায়ী হবে, নববধূ চিরদিন নববধূ থাকবে।

—আপনি এ রকম দাম্পত্যের চেষ্টা করেছিলেন?

—একবার মাত্র চেষ্টা করেছিলুম, তা বিফল হয়েছে। কিন্তু বিফলতার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের থিওরি ভুল, আমার নির্বাচনেই গলদ ছিল। যাই হক, আর চেষ্টা করবার প্রবৃত্তি নেই।

—ঘটনাটা বলবেন কি?

—শুনুন। আমার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের ফরমুলাটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে মনে হল, বাঃ, এই তো দাম্পত্যের শ্রেষ্ঠ মার্গ, চেষ্টা করে দেখা যাক না। আমার গোটাকতক বাড়ি আছে, ছোট-বড় ফ্ল্যাটে ভাগ করা, সেগুলো ভাড়া দিয়ে থাকি। একদিন একটি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। নাম বাগেশ্রী দত্ত, বয়স আন্দাজ চল্লিশ, কিন্নর-বিদ্যাপীঠে গান বাজনা নাচ শেখান। দেখতে মন্দ নয়, আমার পছন্দ হল, ক্রমে ক্রমে আলাপও হল। ভাবলুম, এক নম্বর দাম্পত্যের আশা নেই, দু নম্বরেও রুচি নেই। এই বাগেশ্রীকে নিয়ে তিন নম্বরের চেষ্টা করা যাক। যখন আলাদা আলাদা বাস করব তখন তো আদর্শ আর মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। তার সঙ্গে দেখা করে বললুম, শোন বাগেশ্রী, আমাকে বিয়ে করবে? আমি নিজের বসত বাড়িতে থাকব, তোমাকে আমার রসা রোডের বাড়িটা দেব, সেটাও বেশ ভাল বাড়ি। তোমাকে টাকাও প্রচুর দেব। তুমি নিজের বাড়িতে নিজের মতে চলবে, আমার পছন্দ অপছন্দ মানতে হবে না। মাসে এক দিন আমি তোমার অতিথি হব, আর এক দিন তুমি আমার অতিথি হবে। এই শর্তে বিয়ে করতে রাজী আছ? বাগেশ্রী বললে, এক্ষুনি। খাসা হবে, আমার বাড়িতে আমার মা দিদিমা মাসী দুই ভাই আর চার বোনকে এনে রাখব, এই ফ্ল্যাটটায় তো মোটেই কুলয় না। আমি বললুম, তা তো চলবে না, তোমার বাড়িতে আমি গেলে ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব যে। বাগেশ্রী বললে,

তোমাকে সেখানে যেতে কে বলছে? নিজের বাড়িতেই তুমি থাকবে, আমিও তোমার কাছে থাকব। তুমি যা ন্যালাখ্যাপা মানুষ, আমি না দেখলে চাকর বাকর সর্বস্ব লোপাট করবে, বাপ রে, সে আমি সইতে পারব না। আমার পিসেমশায়ের ভাগনে প্রাণতোষ দাদাও আমার কাছে থাকবে, সেই সব দেখবে শুনবে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বাগেশ্রীর মতলবটি শুনে আমি তখনই সরে পড়লুম। তার পর সে তিন দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি।

আমি প্রশ্ন করলুম, উকিলের চিঠি পান নি?

অক্রূরবাবু বললেন, পেয়েছিলুম। উত্তরে জানালুম, ব্রীচ অভ প্রমিস হয় নি, আমি খেসারত এক পয়সাও দেব না। তবে বাগেশ্রী যদি দু মাসের মধ্যে তার প্রাণতোষ দাদা বা আর কাকেও বিবাহ করে তবে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছি। বাগেশ্রী তাতেই রাজী হয়েছিল।

—সকলকেই যৌতুক দিলেন, শুধু সত্যভামা বেচারী ফাঁকে পড়লেন!

—তিনিও একবারে বঞ্চিত হন নি। পুরী থেকে চলে আসবার তিন মাস পরে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলুম—হুণ্ডাগড়ের খুড়া সাহেবের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ হচ্ছে। আমি একটি ছোট্ট পিকিনীজ কুকুর সত্যভামাকে উপহার পাঠিয়ে দিলুম, খুব খানদানী কুকুর, তার জন্য প্রায় আট শ টাকা খরচ হয়েছিল।

—এক দুই তিন নম্বর সবই তো পরীক্ষা করেছেন, আপনার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম কি?

—কিছুই স্থির করতে পারি নি। আপনি তো বোদ্ধা লোক, একটা পরামর্শ দিন না।

—দেখুন অক্রূরবাবু, আপনার ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা হয়েছে। যা বলছি তাতে দোষ নেবেন না। আমি সামান্য লোক, শরীর বা মনের তত্ত্ব কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি যে পুং-হরমোনের কথা বলেছেন তা হরেক রকম আছে। একটাতে দাড়ি গজায়, আর একটাতে গুঁতিয়ে দেবার অর্থাৎ আক্রমণের শক্তি আসে, আর একটাতে সর্দারি করবার প্রবৃত্তি হয়। তা ছাড়া আরও একটা আছে যা থেকে প্রেমের উৎপত্তি হয়। বোধ হচ্ছে আপনার সেইটের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। আপনি কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে অক্রূরবাবু বললেন, তাই করা যাবে।

আমি নমস্কার করে বিদায় নিলুম। তার পরে আর অক্রূর নন্দীর সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেছি তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করে দ্বারকাধামে তপস্বিনী জগদম্বা মাতাজীর আশ্রমে বাস করছেন। ভদ্রলোক শেষকালে আত্মসমর্পণই করলেন। আশা করি তিনি শান্তি পেয়েছেন।

১৩৫৯

বদন চৌধুরীর শোকসভা

বদনচন্দ্র চৌধুরী একজন নবাগত নারকী, সম্প্রতি রৌরবে ভরতি হয়েছেন। যমরাজ আজ নরক পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখে বদন হাত জোড় করে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

যম বললেন, কি চাই তোমার?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি।

—কবে এসেছ এখানে?

—আজ এক মাস হল।

—এর মধ্যেই ছুটি কেন? ছুটি নিয়ে কি করবে?

—আজ্ঞে, একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাই। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমার জন্যে শোকসভা হবে, বড্ড ইচ্ছে করছে একবার দেখে আসি।

যমালয়ের নিবন্ধক অর্থাৎ রেজিস্ট্রার চিত্রগুপ্ত কাছেই ছিলেন। যম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই প্রেতটার প্রাক্তন কর্ম কি?

চিত্রগুপ্ত বললেন, এর পূর্বনাম বদনচন্দ্র চৌধুরী, পেশা ছিল ওকালতি তেজারতি আর নানা রকম ব্যাবসা। প্রায় দশ বছর করপোরেশনের কাউন্সিলার আর পাঁচ বছর বিধান সভাব সদস্য ছিল। এক মাস হল এখানে এসেছে, হরেক রকম বজ্জাতির জন্য হাজার বছর নরকবাসের দণ্ড পেয়েছে। এখন রৌরব নরকে গ-বিভাগে আছে। বর্তমান আচরণ ভালই। ঘণ্টা দুইএর জন্য ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। শোকসভায় ওর বন্ধু আর স্তাবকরা কে কি বলে তা শোনবার জন্য আগ্রহ হওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

—ও খবর পেলে কি করে যে আজ শোকসভা হবে?

—খবরের অভাব কি ধর্মরাজ, রোজ কত লোক মরছে আর সোজা নরকে চলে আসছে। তাদের কাছ থেকেই খবর পেয়েছে।

যম আজ্ঞা দিলেন, বেশ, দু ঘণ্টার জন্য ওকে ছেড়ে দাও, সঙ্গে একজন প্রহরী থাকে যেন।

চিত্রগুপ্ত হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে কাকজঙ্ঘ, তুমি এই পাপীর সঙ্গে মর্তলোকে যাও। দেখো যেন নতুন পাপ কিছু না করে। ঠিক দু ঘণ্টা পরেই ফেরত আনবে।

যে আজ্ঞে বলে যমদূত কাকজঙ্ঘ বদন চৌধুরীর হাত ধরে যমালয় থেকে বেরিয়ে গেল।

অনন্তর যমরাজ অন্য এক মহলে এলেন। তাঁকে দেখে ঘনশ্যাম ঘোষাল কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ হলেন।

যম বললেন, তোমার আবার কি চাই?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি। একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাচ্ছি।

—তোমারও শোকসভা হবে নাকি? এখানে এসেছ কবে?

—দু বছর হল এখানে এসেছি, রৌরবে থ-বিভাগে আছি। আমার জন্যে কেউ শোকসভা করে নি প্রভু। বন্ধুরা বড়ই নিমক-হারাম, আমার মৃত্যুর পর আমারই 'কালকেতু' কাগজে মোটে আধ কলম ছেপেছিল, একটা ভাল ছবি পর্যন্ত দেয় নি। বদন চৌধুরী আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁরই শোকসভায় যাবার জন্য ছুটি চাচ্ছি।

চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা দেখে বললেন, তুমি অতি পাজী প্রেত, যমালয়ে এসেও মিছে কথা বলছ। তোমার কাগজে তো চিরকাল বদন চৌধুরীকে গালাগাল দিয়েছ।

—আজ্ঞে, সম্পাদকের কঠোর কর্তব্য হিসেবে তা করতে হয়েছে।

কিন্তু আগে বদনের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, পরে মনান্তর হয়। এখন মরণের পর শত্রুতার অবসান হয়েছে, মরণান্তানি বৈরাণি, আমরা আবার বন্ধু হয়ে গেছি।

যম চিত্রগুপ্তকে বললেন, যাক গে, দু ঘণ্টার জন্য একেও ছেড়ে দিতে পার। সঙ্গে যেন একটা প্রহরী থাকে।

চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূত ভৃঙ্গরোল ঘনশ্যামের সঙ্গে গেল।

পরলোকগত বদন চৌধুরীর শোকসভায় খুব লোকসমাগম হয়েছে। বেদীর উপরে আছেন সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায়বাহাদুর গোবর্ধন মিত্র, তাঁর ডান পাশে আছেন প্রধান বক্তা প্রবীণ অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী, বাঁ পাশে আছেন বদনের বন্ধু ও সভার আয়োজক ব্যারিস্টার কোকিল সেন। আরও কয়েক জন গণ্যমান্য লোক কাছেই বসেছেন। বক্তাদের জন্য দুটো মাইক্রোফোন খাড়া হয়ে আছে এবং সভার বিভিন্ন স্থানে গোটা কতক লাউড স্পীকার বসানো হয়েছে।

বদন চৌধুরী তাঁর রক্ষী যমদূতের সঙ্গে বেদীর উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘনশ্যাম ঘোষালকে দেখে বললেন, তুমি কি মতলবে এখানে এসেছ? সভা পণ্ড করতে চাও নাকি?

ঘনশ্যাম বললেন, আবে না না, পণ্ড করব কেন, তুমি হলে আমার পুরনো বন্ধু। তোমার গুণকীর্তন শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করতে এসেছি। যমরাজ আজ খুব সদয় দেখছি, দু-দুটো নারকীকে ছুটি দিয়েছেন।

প্রধান বক্তা আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর পিছনে বদন চৌধুরী এবং সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের পিছনে ঘনশ্যাম ঘোষাল দাঁড়ালেন। দুই

যমদূত নিজের নিজের বন্দীর কাঁধে হাত দিয়ে রইল। সভার কোনও লোক এই চার জনের অস্তিত্ব টের পেলে না।

প্রথমেই শ্রীযুক্তা ভূপালী বসুর পরিচালনায় সংগীত হল।—আজি স্মরণ করি পুণ্য চরিত বদনচন্দ্র চৌধুরীর, সেই স্বর্গগত রাজর্ষির; লোকমান্য অগ্রগণ্য কর্মযোগী ধর্মবীর।..ইত্যাদি। গান থামলে বাঁশি আর মাদলের করুণ সংগত সহযোগে কুমারী লুলু চ্যাটার্জি একটি সময়োচিত শোকনৃত্য নাচলেন। তার পর সভাপতির আজ্ঞাক্রমে অধ্যাপক আঙিগরস গাঙগুলী মৃত মহাত্মার কীর্তিকথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন।—

আজ যাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্য আমরা এখানে এসেছি তিনি আমাদের শোকস্যাগরে নিমজ্জিত করে দিব্যধামে গেছেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে তাঁর আত্মা এই সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। স্বর্গত বদনচন্দ্র চৌধুরী আকারে চরিত্রে কর্মে ধর্মে এক লোকোত্তব মহীয়ান পুরুষ ছিলেন। তাঁর এই তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে দেখুন, কি বিরাট সৌম্য মূর্তি! নিবিড় শ্যামবর্ণ শালপ্রাংশু বিশাল বপু, পদ্মপলাশ নেত্র, আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু। তিনি একাধারে কর্মযোগী ধর্মযোগী আর জ্ঞানযোগী ছিলেন, যেমন উপার্জন করেছেন তেমনি বহুবিধ সৎকার্যে ব্যয়ও কবেছেন। এক কথায় তিনি যে একজন খাঁটী রাজর্ষি ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আশা করি তাঁর উপযুক্ত পুত্রগণ তাঁদের পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।.. এই রকম বিস্তর কথা আঙিগরসবাবু এক ঘণ্টা ধরে শোনালেন।

ঘনশ্যাম জনান্তিকে বললেন, আহা, কানে যেন মধু ঢেলে দিলে, নয় হে বদন?

তার পর একজন তরুণ কবি একটি গদ্য কবিতা পাঠ করলেন।

—আকাশের গায়ে সোনালী আঁচড়। কিসের দাগ ওটা? দিব্য-রথের টায়ারের কর্ষণ। ওই সড়কে বদনচন্দ্র দেবযানে গেছেন। কে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে? উর্বশী না আফ্রোদিতি?... ইত্যাদি।

আরও কয়েক জন বক্তৃতা দেবার পর ব্যারিস্টার কোকিল সেন দাঁড়ালেন। পূর্বের বক্তারা যেটুকু বাকী রেখেছিলেন তা নিঃশেষে বিবৃত করে ইনি বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের একটি মর্মরমূর্তি দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় পার্কে স্থাপন করা হক, এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা আর অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য অমুক অমুক অমুককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হক।

পিছনের বেঞ্চ থেকে একজন শ্রোতা বললেন, বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। মরা মানুষের নিন্দে করতে চাই না, কিন্তু তার মূর্তির জন্য আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না।

সভায় হাততালি হল, প্রথমে অল্প, যেন ভয়ে ভয়ে, তার পর খুব জোরে। গোলমাল থামলে কোকিল সেন বললেন, আমরা অশ্রদ্ধার দান চাই না, মৃত মহাপুরুষের পুত্রগণই সব খরচ দেবেন।

বেদীর উপর থেকে একজন আস্তে আস্তে বললেন, হিয়ার হিয়ার।

অতঃপর সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের বক্তৃতার পালা। জজিয়তির সময় তিনি লম্বা লম্বা রায় দিয়েছেন, দু-চারটে ফাঁসির হুকুমও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু সভায় কিছু বলতে গেলেই তিনি নার্ভস হয়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কোকিল সেনই লিখে দিয়েছেন। গোবর্ধনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর ভাষণটি পড়বার উপক্রম করছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘনশ্যাম ঘোষাল তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর কাঁধে চড়লেন। যমদূত ভৃঙ্গরোল আটকাতে গেল, কিন্তু ঘনশ্যাম নিমেষের মধ্যে গোবর্ধনবাবুর কানের ভিতর দিয়ে তাঁর মরমে প্রবেশ করলেন।

মানুষের শরীরের মধ্যে যেটুকু ফাঁক আছে তাতে একটা আত্মা কোনও গতিকে থাকতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুটো আত্মার জায়গা নেই। ঘনশ্যাম ঢুকে পড়ায় গোবর্ধনবাবুর নিজের আত্মাটি কোণ-ঠাসা হয়ে গেল, তাকে দাবিয়ে রেখে ঘনশ্যামের প্রেতাত্মা তারস্বরে বক্তৃতা শুরু করলে।—

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বেশী কিছু বলবার নেই। শেষের বেঞ্চের ওই ভদ্রলোকটি যা বলেছেন তা খুব খাঁটী কথা। বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। যত দিন বেঁচে ছিল তত দিন সে নিজের ঢাক নিজে পিটেছে। এখন সে মরেছে, তবু আমরা রেহাই পাই নি। তার খোশামুদে আত্মীয় স্বজন তাকে দেবতা বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন আর ধাপ্পাবাজি চলবে না। বদন স্বর্গে যায় নি, নরকেই গেছে। অমন জোচ্চোর ছ্যাঁচড় হারামজাদা লোক আর হবে না মশাই, কত মক্কেলের সর্বনাশ করেছে, করপোরেশনে আর অ্যাসেম্‌ব্লিতে থাকতে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে, পারমিটে আর কালোবাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা—

বদন চৌধুরী চুপ করে থাকতে পারলেন না। যমদূত কাকজঙ্ঘকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিনি অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর শরীরে ভর করলেন। দ্বিতীয় মাইকটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের মাননীয় সভাপতি মশাই প্রকৃতিস্থ হয়ে নেই। যে লোকটা পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বদনচন্দ্রের ঘোর শত্রু ছিল, সেই নটোরিয়স কাগজী গুণ্ডা কালকেতু-সম্পাদক ঘনা ঘোষালের প্রেতই সভাপতির ঘাড়ে চেপেছে এবং এই অসহায় গোবেচারা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে—

সভাপতির জবানিতে ঘনশ্যাম বললেন, একবারে ডাহা মিথ্যে

কথা। সেই বজ্জাত বদনার ভূতই আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মশাইকে কাবু করে যা-তা বলছে—

আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর মারফত বদন চৌধুরী বললেন, আপনারা কি সেই ব্ল্যাকমেলার শয়তান ঘনা ঘোষালকে ভুলে গেছেন? ব্যাটা টাকা খেয়ে তার কাগজে কালোবাজারী চোরদের প্রশংসা ছাপত, টাকা না পেলে গাল দিত। মন্ত্রীদের ভয় দেখিয়ে সে নিজের ওআর্থলেস ছেলে মেয়ে শালা শালীদের জন্যে ভাল ভাল চাকরি যোগাড় করেছিল। স্বর্গত মহাত্মা বদন চৌধুরী তাকে ঘুষ দেন নি সেই রাগে ঘনা ঘোষালের ভূত আজ নরককুণ্ডু থেকে উঠে এসে এখানে কুৎসা রটাচ্ছে। ওর দুর্গন্ধে সভা ভরে গেছে, টের পাচ্ছেন না? ভূতের কথায় কান দেবেন না আপনারা।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল। একজন ষণ্ডা গোছের লোক একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বললে, ভূত টুত গ্রাহ্য করি না মশাই, আমার নাম রামলাল সিংগি। ভূত আমার সম্বন্ধী, শাঁকচুন্নী আমার শাশুড়ী। আসল কথা কি জানেন—আমাদের গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরসবাবু খুব মহাশয় লোক, কিন্তু দুজনেই বেশ টেনে এসেছেন, নেশায় চুচ্চুরে হয়ে বক্তিমে করছেন। বদন চৌধুরী মরেছে, সবাই মিলে শোকসভা করছিল, এ তো বহুত আচ্ছা। তোরা গান শুনবি, নাচ দেখবি, দুটো হা-হুতোশ করবি, বুক চাপড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিবি, আউর ভি আচ্ছা। কিন্তু একি কাণ্ড, দু হাজার লোকের সামনে মাতলামি করছিস! আরে ছ্যা ছ্যা। আমরা যা করি নিজের আড্ডায় করি, সভায় দাঁড়িয়ে এমন বেলেল্লাপনা করি না। হাঁ মশাই, হক কথা বলব।

এই সময়ে দুই যমদূত গোবর্ধন মিত্র আর আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর কানে কানে বললে, বেরিয়ে এস শীগ্‌গির, দু ঘণ্টা কাবার হয়েছে।

দুই প্রেতাত্মা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল, যমদূতরা তখনই তাদের নিয়ে উধাও হল।

শরীর থেকে প্রেত নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র গোবর্ধনবাবু আর আণ্ডিগবসবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় এঁরা শীঘ্রই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বললেন, এই দুটো গেলাসের শরবত এঁরা খেয়েছিলেন। টেস্ট করা দরকার, নিশ্চয় কোনও বদ লোক ভাঙ কিংবা ধুতরো মিশিয়ে দিয়েছিল।

প্রেততত্ত্ববিশারদ হারাধন দত্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, সিদ্ধি গাঁজা ধুতরো নয়, মদও নয়, ওসব আমার ঢেব পরীক্ষা করা আছে। এ হল আসল ভৌতিক ব্যাপার মশাই, আজ আপনারা স্বকর্ণে দুই প্রেতেব ঝগড়া শুনেছেন। এর ফল বড় খারাপ, বাড়ি গিয়ে কানে একটু তুলসীপাতাব রস দেবেন।

সভা ভেঙে গেল।

১৩৫৯

যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট

ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠক বসেছে। আজ বক্তৃতা দিলেন ডাক্তার হরিশ চাকলাদার, এম ডি, এল আর সি পি, এম আর সি এস। মৃত্যুর লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বললেন। চার-পাঁচ ঘণ্টা শ্বাস-রোধের পরেও আবার নিঃশ্বাস পড়ে, ফাঁসির পরেও কিছুক্ষণ হৃৎস্পন্দন চলতে থাকে, দুই হাত দুই পা কাটা গেলেও এবং দেহের অর্ধেক রক্ত বেরিয়ে গেলেও মানুষ বাঁচতে পারে, ইত্যাদি। অতএব রাইগার মর্টিস না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় কুঁকড়ে আড়ষ্ট হয়ে না গেলে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

বক্তৃতা শেষ হলে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হল, কেউ কেউ নানা রকম মন্তব্যও করলেন। বক্তার সহপাঠী ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, ওহে হরিশ, তুমি বড্ড হাতে রেখে বলেছ। আসল কথা হচ্ছে, ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা না হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। শিবপুরের দশরথ কুণ্ডুর কথা শোন নি বুঝি? বুড়ো হাড়-কঞ্জুস, অগাধ টাকা, মরবার নামটি নেই। ছেলে রামচাঁদ হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, নিঃশ্বাস বন্ধ হল, নাড়ী থামল, শরীর হিম হয়ে সিটকে গেল। ডাক্তার বললে, আর ভাবনা নেই রামচাঁদ, তোমার বাবা নিতান্তই মরেছেন। রামচাঁদ ঘটা করে বাপকে ঘাটে নিয়ে গেল, বিস্তর চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা সাজালে, তার পর যেমন খড়ের নুড়ো জেবলে মুখাগ্নি করতে যাবে অমনি বুড়ো উঠে বসল। অ্যাঁ, এসব কি?—বলেই ছেলের গালে এক চড়।

সবাই ভয়ে পালাল। বুড়ো গটগট করে বাড়ি ফিরে এসে ঘটককে ডাকিয়ে এনে বললে, রেমোকে ত্যাজ্যপুত্তুর করলুম, আমার জন্যে একটা পাত্রী দেখ।

সভাপতি ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ি একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। এ'র বয়স এখন নব্বুই, শরীর ভালই আছে, তবে কানে একটু কম শোনেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল দেখে আবোল-তাবোল বকেন। ইনি কোথায় ডাক্তারি শিখেছিলেন, কলকাতায় কি বোম্বাইএ কি রেঙ্গুনে, তা লোকে জানে না। কেউ বলে, ইনি সেকেলে ভি এল এম এস। কেউ বলে, ওসব কিছু নন, ইনি হচ্ছেন খাঁটী হ্যামার-ব্র্যান্ড, অর্থাৎ হাতুড়ে। নিন্দুকরা যাই বলুক, এককালে এ'র অসংখ্য পেশেণ্ট ছিল, সাধারণ লোকে এ'কে খুব বড় সার্জন মনে করত। প্রায় পঁচিশ বৎসর প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ইনি এখন ধর্মকর্ম সাধুসঙ্গ আর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ক্লাবের বাড়িটি ইনিই করে দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ সদস্যগণ এ'কে আজীবন সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। সকলেই এ'কে শ্রদ্ধা করেন, আবার আড়ালে ঠাট্টাও করেন।

হাসির শব্দে ডাক্তার যদু গড়গড়ির ঘুম ভেঙে গেল। মিটমিট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি?

হরিশ চাকলাদার বললেন, আজ্ঞে বেণী বলছে, ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা না হলে মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

যদু ডাক্তার বললেন, এই বেণীটা চিরকেলে মুখ্খু। বিলেত থেকে ফিরে এসে মনে করেছে ও সবজান্তা হয়ে গেছে। জীবন-মৃত্যুর তুমি কতটুকু জান হে ছোকরা?

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত ছোকরা নন, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। হাত-

জোড় করে বললেন, কিছুই জানি না সার, আমি তামাশা করে বলেছিলুম।

—তামাশা! মরণ-বাঁচন নিয়ে তামাশা!

যদু ডাক্তার চিরকালই দুর্মুখ, তাঁর অত পসার হওয়ার এও একটা কারণ। লোকে মনে করত, রোগী আর তার আত্মীয়দের যে ডাক্তার বেপরোয়া ধমক দেয় সে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। বয়স বৃদ্ধির ফলে তাঁর মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে, কিন্তু তাঁর কটুবাক্যে কেউ রাগ করে না। তাঁকে শান্ত করবার জন্য ডাক্তার অশ্বিনীকুমার সেন এম বি বি এস, কবিরত্ন, বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন, সার, আজকের সাবজেক্ট সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

যদু ডাক্তার বললেন, আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে কেন, আমার তো এখন ডোটেজ, যাকে বলে ভীমরতি।

অশ্বিনী সেন বললেন, সে তো মহা ভাগ্যের কথা। সাতাত্তর বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রির নাম ভীমরথী। আপনি তা বহুকাল পার হয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই দুস্তরা রাত্রি অতিক্রম করে যিনি বেঁচে থাকেন তাঁর প্রতিদিনই যজ্ঞ, তাঁর চলা-ফেরা বিষ্ণুপ্রদক্ষিণের সমান, তাঁর বাক্যই মন্ত্র, নিদ্রাই ধ্যান, যে অন্ন খান, তাই সুধা। আপনার কথা বিশ্বাস করব না—সে কি একটা কথা হল?

—কিন্তু ওই বেণী কাপ্তেন? ও বিশ্বাস করবে?

বেণী দত্ত আবার হাতজোড় করে বললেন, নিশ্চয় করব সার, যা বলবেন তা বেদবাক্য বলে মেনে নেব।

যদু ডাক্তার প্রসন্ন হয়ে বললেন, নেহাত যদি শুনতে চাও তো শোন। কিন্তু তোমরা হয়তো ভয় পাবে।

বেণী দত্ত বললেন, যদি ভুতুড়ে কাণ্ড না হয় তবে ভয় পাব কেন সার?

—না না, ভুতুড়ে নয়। কিন্তু যে কেস-হিস্টরি বলছি তা অতি ভীষণ; অথচ এতে শুধু সার্জারির ক্লাইম্যাক্স নয়, প্রেমেরও পরাকাষ্ঠা পাবে।

—বাঃ, বিভীষিকা সার্জারি আর প্রেম, এর চাইতে ভাল কম্বিনেশন হতেই পারে না। আপনি আরম্ভ করুন সার, আমরা শোনবার জন্য ছটফট করছি।

ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড় বলতে লাগলেন।— প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তোমাদের সাল্‌ফা পেনিসিলিন আর স্ট্রেপ্টো ক্লোরো না টেরা কি বলে গিয়ে—এ সবের রেওয়াজ হয় নি। কারও বাড়িতে অপারেশন হলে আয়োডোফর্মের খোশবায়ে পাড়া সুদ্ধ মাত হয়ে যেত, লোকে বুঝত, হাঁ, চিকিৎসা হচ্ছে বটে। আমি তখন কালীঘাটে বাস করতুম। আমার বাড়ির কাছে এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ থাকতেন, নাম বিঘোরানন্দ, তিনি কামরূপ-কামাখ্যায় আর তিব্বতে বহু বৎসর সাধনা করেছিলেন। ভক্তরা তাঁকে বিঘোর বাবা বা শুধু বাবাঠাকুর বলত। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, লম্বা চওড়া চেহারা, ঘোর কাল রং, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, দেখলেই ভক্তিতে মাথা নীচু হয়ে আসে। আমি তাঁর কার্বংকল অপারেশন করেছিলুম। একটু চাঙ্গা হবার পর তিনি একগোছা নোট আমার হাতে দেবার চেষ্টা করলেন। হাত টেনে নিয়ে আমি বললুম, করেন কি, আপনার কাছে কি আমি ফী নিতে পারি? বিঘোর বাবা একটু হেসে বললেন, তুমি না নিলেও ও টাকা তোমার হয়ে গেছে। কথাটার মানে তখন বুঝতে পারি নি, তাঁকে নমস্কার করে বিদায় নিলুম।

বাড়ি ফিরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা ভুর্জপত্রের

মোড়কে দশটা গিনি রয়েছে। বুঝলুম বিঘোর বাবার দান তাঁর অলৌকিক শক্তিতে আমার পকেটে চলে এসেছে। তার পর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতুম, নানা রকম আশ্চর্য তত্ত্বকথা শুনতুম। বছর খানিক পরে তিনি কালীঘাট থেকে চলে গেলেন, তাঁর একজন বড়লোক ভক্ত ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাব ধারে একটি আশ্রম বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানেই গিয়ে রইলেন। একাই থাকতেন, তবে ভক্তবা মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেত।

তার পর দু বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, খবরও কিছু পাই নি। একদিন বেলা বারটায় বাড়ি ফিরে এসেছি, একটা হার্নিয়া, দুটো অ্যাপেনডিক্স, তিনটে টিউমার, চারটে টনসিল, আর গোটা পাঁচেক হাইড্রোসিল অপারেশন করে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছি। নাওয়া খাওয়ার পর স্ত্রীকে বললুম, আমি বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘুমুব, খবরদার কেউ যেন না ডাকে। কিন্তু ঘুমুবার জো কি। ঘণ্টা খানিক পরেই ঠেলা দিয়ে গিন্নী বললেন, ওগো শুনছ, জরুবী তার এসেছে। বললুম, ছিঁড়ে ফেলে দাও। গিন্নী বললেন, এ যে বিঘোর বাবার তার। অগত্যা টেলিগ্রামটা পড়তে হল, লিখেছেন—এখনই চলে এস, মোস্ট আর্জেণ্ট কেস।

তখনই মোটরে রওনা হলুম। ব্যাগটা সঙ্গে নিলুম, তাতে শুধু মামুলী সরঞ্জাম ছিল, কি রকম কেস কিছুই জানা নেই সেজন্য বিশেষ কোনও ওষুধপত্র নিতে পাবলুম না। শীতকাল, পেঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিঘোর বাবার আশ্রমটি ত্রিবেণীর কাছে কাগমারি গ্রামে গঙ্গার ধারে। খুব নির্জন স্থান, কাছাকাছি লোকালয় নেই। গাড়ি থেকে নেমে আশ্রমের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বিঘোব বাবার সঙ্গে দেখা। পরনে লাল চেলির জোড়, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, পায়ে খড়ম, হুঁকো হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছেন।

আমাকে দেখে বললেন, এস ডাক্তার। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এ'র কোনও ফ্যাসাদ হয় নি। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম, পেশেন্ট কে? কি হয়েছে? বললেন, ঘরের ভেতরে এস, স্বচক্ষে দেখলেই বুঝবে।

ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু আলো অতি কম, এক কোণে পিলসুজের মাথায় পিদিম জ্বলছে, তাতে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে দৃষ্টি খুললে নজরে পড়ল—ঘরের এক পাশে একটা তক্তাপোশ, বোধ হয় বিঘোর বাবা তাতেই শোন। আর এক পাশে মেঝেতে একটা মাদুরের ওপর দুজন পাশাপাশি চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে, একখানা কম্বল দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা, শুধু মুখ দুটো বেরিয়ে আছে। একজন পুরুষ, জোয়ান বয়স, বোধ হয় পঁচিশ, মুখে দাড়ি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আর একজন মেয়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি, কালো কিন্তু সুশ্রী, ঝুঁটি-বাঁধা খোঁপা, সিঁথিতে সিঁদুর।

জিজ্ঞাসা করলুম, স্বামী-স্ত্রী?

বিঘোর বাবা উত্তর দিলেন, উঁহু, প্রেমিক-প্রেমিকা।

—কি হয়েছে?

—নিজেই দেখ না।

স্টেথোস্কোপটি গলায় ঝুলিয়ে হেঁট হয়ে কম্বলখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেললুম। তার পরেই এক লাফে পিছনে ছিটকে এলুম। কম্বলের নীচে কিছু নেই, শুধু দুটো মুণ্ডু পাশাপাশি পড়ে আছে।

ভয়ও হল রাগও হল। বিঘোর বাবাকে বললুম, আমাকে এরকম বিভীষিকা দেখাবার মানে কি? এ তো ক্রিমিন্যাল কেস, যা করতে হয় পুলিস করবে, আমার কিছু করবার নেই। কিন্তু আপনি যে

মহাবিপদে পড়বেন। বাবা শুধু একটু হাসলেন। তার পর দেখলুম, পুরুষ-মুণ্ডুটা পিটপিট করে তাকিয়ে চিঁচিঁ করে বলছে, মরি নি ডাক্তারবাবু। মেয়ে-মুণ্ডুটাও ডাইনে বাঁয়ে একটু নড়ে উঠল।

ডিসেকশন রুমে বিস্তর মড়া ঘেঁটেছি, হরেক রকম বীভৎস লাশ দেখেছি, কিন্তু এমন ভয়ংকর পিলে-চমকানো ব্যাপার কখনও দৃষ্টি-গোচর হয় নি। আমি আঁতকে উঠে পড়ে যাচ্ছিলুম, বিঘোর বাবা আমাকে ধরে ফেলে বললেন, ওহে গড়গড়ি ডাক্তার, ভয় নেই, ভয় নেই, মুণ্ডু কাটা গেছে কিন্তু আমি এদের বাঁচিয়ে রেখেছি। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা শুনেছ? তারই প্রভাবে এরা এখনও বেঁচে আছে।

সেই শীতে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, এদের ধড় কোথায় গেল?

—ওই যে, ওই কোণটায় কম্বলের নীচে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

বিঘোর বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ধড় দুটোও বাঁচিয়ে রেখেছি, দেখ না তোমার চোঙা লাগিয়ে।

স্টেথোস্কোপের দরকার হল না। বুকে হাত দিয়ে দেখলুম হার্ট আর লংস ঠিক চলছে, তবে একটু ঢিমে। বিঘোর বাবাকে বললুম, ধন্য আপনার সাধনা, বিলিতী বিজ্ঞানের মুখে আপনি জুতো মেরেছেন। কিন্তু এতই যদি পারেন তবে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা রেখেছেন কেন? জুড়ে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়।

বিঘোর বাবা বললেন, তা আমার কাজ নয়। আমি মৃত-সঞ্জীবনী জানি, কিন্তু খণ্ডযোজনী বিদ্যা আমার আয়ত্ত নয়। ও হল মুচী বা ডাক্তারের কাজ। মুচী আবার লাশ ছোঁবে না, তার মোটরও নেই যে এই অবেলায় এত দূরে আসবে, তাই তোমাকে ডেকেছি। তুমি ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডু সেলাই করে দাও।

আমি নিবেদন করলুম, বাইরের চামড়া সেলাই করলেই তো

গলার হাড় আর নলী জুড়বে না। সার্কুলেশন রেস্পিরেশন এবং স্পাইন্যাল কর্ডের সঙ্গে ব্রেনের যোগ কি করে হবে? সেরিব্রেশন অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলবে কি করে?

—কেন চলবে না? দুই ভুরুর মধ্যে আজ্ঞাচক্র ঘুরছে, তাতেই পঞ্চেন্দ্রিয় আর মনের ক্রিয়া চলছে। কাটা মুণ্ডু কথা কয়েছে তা তো তুমি স্বকর্ণে শুনেছ। কোনও চিন্তা নেই, তুমি সেলাই করে ফেল।

আমি বললুম, সেলাইএর উপযুক্ত বাঁকা ছুঁচ আর ক্যাটগট তো আমার সঙ্গে নেই, আর সেপসিস অর্থাৎ পচ বন্ধ করব কি করে?

—তোমাকে একটা গুনছুঁচ আর সুতলি দড়ি দিচ্ছি। পচবার ভয় নেই, দেখছ না, কাটা জায়গায় গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করে দিয়েছি। ওই কাদা সুদ্ধ সেলাই করে দাও।

বড়ই মুশকিলে পড়া গেল। আয়োজন কিছুই নেই, অ্যাসিস্টাণ্ট নেই, নার্স নেই, অপারেশন টেব্‌ল নেই, আলো পর্যন্ত নেই, অথচ বিঘোরানন্দ আমাকে এমন সার্জারি করতে বলছেন, যা কস্মিন্‌ কালে কোথাও হয় নি—

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, হয়েছিল সার—গজানন গণেশ আর অজানন দক্ষ।

—আরে তাঁরা হলেন দেবতা। আচ্ছা বেণী, আজকাল বড় অপারেশনের আগে তোমরা নাকি হরেক রকম টেস্ট করাও?

—আজ্ঞে হাঁ। ব্লাড-প্রেশার, ব্লাড-কাউণ্ট, ব্লাড-শুগার, এক্স-রে ফোটো, কার্ডিওগ্রাম প্রভৃতি মামুলী রুটিন টেস্ট তো আছেই, তা ছাড়া নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন, টোটাল হেভি হাইড্রোজেন, বডি-ফ্যাটের আয়োডিন-ভ্যালু, হাড়ের ইলাস্টিসিটি, দাঁতের রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি, চামড়ার স্পেকট্রোগ্রাম—এসবও দেখা দরকার।

অধিকন্তু রোগী আর তার আত্মীয়দের ইন্‌টেলিজেন্স কোশণ্ট টেস্ট করালে খুব ভাল হয়। শাঁসালো পেশেণ্ট হলে অন্তত বিশজন স্পেশ্যালিস্টের রিপোর্ট নেওয়া চাই। আর গরিব পেশেণ্টকে বলে দিই, উঁচু দরের চিকিৎসা তোমার সাধ্য নয় বাপু, দাতব্য হোমিও-প্যাথিক খাও গিয়ে, না হয় পাঁচ সিকের মাদুলি ধারণ কর।

যদু ডাক্তার বললেন, আমাদের আমলে অত সব ছিল না, জিব আর নাড়ী, থার্মমিটার আর স্টেথোস্কোপ, এতেই যা করে। আর এই দুটি পেশেণ্টের তো চূড়ান্ত অপারেশন মুণ্ডচ্ছেদ আগেই হয়ে গেছে, এখন টেস্ট করা বৃথা। যাক, তার পর যা হয়েছিল শোন। আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বিঘোরানন্দ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, অত মাথা ঘামিও না ডাক্তার, শুধু সেলাই করে দাও, বাকীটুকু কুলকুণ্ডলিনী নিজেই করে নেবেন।

আমি বললুম, বাবাঠাকুর, ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডু সেলাই করা সার্জনের কাজ নয়, থিয়েটারের বাবা মুস্তাফার কাজ। বেশ, আপনার আজ্ঞা পালন করব, কিন্তু এই দু জনের হিস্টরি তো বললেন না, এদের এমন দশা হল কি করে?

বিঘোরানন্দ এই ইতিহাস বললেন।—মেয়েটার নাম পঞ্চী, ওর বাপ হরি কামার বাঁশবেড়েতে থাকে। পঞ্চীর বিয়ে হয়েছে এই কাগমারি গ্রামের রমাকান্ত কামারের সঙ্গে। রমাকান্ত লোকটা অতি দুর্দান্ত, দেখতে যমদূতের মতন, বদরাগী আর মাতাল। সে জমিদার-বাড়িতে প্রতি বৎসর নবমী পুজোয় এক শ আটটা পাঁঠা, দশটা ভেড়া, আর গোটা দুই মোষ এক এক চোপে কাটে। পঞ্চী তাকে বিয়ে করতে চায় নি, তার বাপ টাকার লোভে জোর করে বিয়ে

দিয়েছে। রমাকান্ত বজ্জাত হলেও আমাকে খুব ভক্তি করে, আমার অনেক ফরমাশও খাটে। সে পঞ্চীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করত, আমি ধমক দিয়েও কিছু করতে পারি নি। এ রকম ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তাই হল। ওই যে পুরুষটার মুণ্ডু দেখছ, ওর নাম জটিরাম বৈরাগী—তোর দেশের লোক, নয় রে পঞ্চী?

পঞ্চীর মাথা ওপর নীচে একটু নড়ে উঠে সায় দিলে।

—এই জটি ছোকরা কীর্তন গায় ভাল, তার জন্য নানা জায়গা থেকে ওর ডাক আসত। জটিরাম মাঝে মাঝে এই গাঁয়ে এলে পঞ্চীর সঙ্গে দেখা করত, শেষটায় দু জনের প্রেম হল।

পঞ্চীর ভুরু আর ঠোঁট একটু কুঁচকে উঠল।

বিঘোরানন্দ বলতে লাগলেন—রমাকান্ত টের পেয়ে একদিন পঞ্চীকে বেদম মারলে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। তার পর গত কাল রাত একটার সময় আমি ঘুমিয়ে আছি এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। উঠে দরজা খুলে দেখি, রাম-দা হাতে রমাকান্ত। আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, সর্বনাশ করেছি বাবাঠাকুর, এক কোপে দুটোকে সাবাড় করেছি, বাঁচান আমাকে।

ব্যাপারটা এই।— আগের দিন রমাকান্ত পঞ্চীকে বলেছিল, আমি ভদ্রেশ্বর যাচ্ছি, চৌধুরী বাবুদের লোহার গেট তৈরি করতে হবে, চার-পাঁচ দিন পরে ফিরব, তুই সাবধানে থাকিস। সব মিথ্যে কথা। রাত দুপুরে রমাকান্ত চুপি চুপি তার বাড়িতে এল এবং আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখলে পঞ্চী আর জটিরাম পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখেই রাম-দায়ের এক কোপে দুজনের মুণ্ডু কেটে ফেললে। তার পর ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছে।

আমি তখনই রমাকান্তর সঙ্গে তার বাড়ি গেলুম। প্রথমেই

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে পণ্ডী আর জটিরামের সূক্ষ্মশরীর আটকে ফেললুম। তার পর রমাকান্তকে বললুম, তুই ধড় দুটো কাঁধে করে আশ্রমে নিয়ে চল, মুণ্ডু দুটো আমি নিয়ে যাচ্ছি। আশ্রমে এসে রমাকান্ত আমার উপদেশ মত ধড় এক জায়গায় আর মুণ্ডু আর এক জায়গায় শুইয়ে দিলে। খণ্ডযোজনের আগে পর্যন্ত এই রকম তফাত রাখাই তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি।

হরিশ চাকলাদার প্রশ্ন করলেন, সূক্ষ্মশরীরও কি দু ভাগ হয়েছিল? মুণ্ডু আর ধড় দুটোই আলাদা হয়ে বেঁচে রইল কি করে?

যদু গড়গড়ি বললেন, তোমরা দেখছি কিছুই জান না। সূক্ষ্মশরীর ভাগ হয় না, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। তার অ্যানাটমি অন্য রকম। কতকটা অ্যামিবার মতন, কিন্তু ঢের বেশী ইলাস্টিক। ধড় আর মুণ্ডু তফাতে থাকলেও সূক্ষ্মশরীর চিটে গুড়ের মতন বেড়ে গিয়ে দুটোতেই ভর করতে পারে। তার পর বিঘোর বাবা যা বলছিলেন শোন।—

রমাকান্ত আবার আমার পায়ে পড়ে বললে, দোহাই বাবাঠাকুর, ফাঁসি যেতে পারব না, আমাকে বাঁচান। আমি বললুম, তুই এক্ষুনি তোর বাড়ি গিয়ে সব রক্ত ধুয়ে সাফ করে ফেলবি, তোর রাম-দা গঙ্গায় ফেলে দিবি, তার পর ত্রিবেণীতে গিয়ে এই টেলিগ্রামটা পাঠাবি, তার পর গায়েব হয়ে থাকবি। এক বৎসর পরে গাঁয়ে ফিরতে পারিস। রমাকান্ত বললে, কিন্তু লাশের গতি কি করবেন? পুলিস টের পেলেই তদারক করতে আসবে, আপনাকেই আসামী বলে চালান দেবে। আমি বললুম, তোকে তা ভাবতে হবে না, যা বলেছি তাই করবি। রমাকান্ত যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। আমার সেই টেলিগ্রাম পেয়ে তুমি এসেছ। এখন আর দেরি নয়, রাত আটটায়

অশ্লেষা পড়বে, তার আগেই সেলাই করে ফেল, নইলে জোড় লাগবে না।

গুন-ছুঁচ আর সুতলি নিয়ে আমি সেলাই করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলুম মুণ্ডু দুটো ফিসফিস করে আপসের মধ্যে কথা বলছে। ক্রমশ পণ্ডীর কণ্ঠস্বর চড়া হয়ে উঠল। বিঘোর বাবা ধমক দিয়ে বললেন, এই পণ্ডী, চেঁচাস নি। আরে গেল যা, এখনও ঘাড়ের ওপর মুণ্ডু বসে নি, এর মধ্যেই গলাবাজি শুরু করেছে!

পণ্ডী ডাকল, অ বাবাঠাকুর, একবারটি শুনুন তো।

বিঘোর বাবা উবু হয়ে অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে পণ্ডী আর জটিরামের কথা শুনলেন। তার পর আমাকে বললেন, ওহে ডাক্তার, এরা বলছে যে জটির ধড়ে পণ্ডীর মুণ্ডু আর পণ্ডীর ধড়ে জটির মুণ্ডু লাগাতে হবে। আমিও ভেবে দেখলুম এই ব্যবস্থাই ভাল।

স্তম্ভিত হয়ে আমি বললুম, এ কি রকম কথা বাবাঠাকুর! মুণ্ডু বদল হতেই পারে না, ভিয়েনা কনভেনশনে তার কোনও স্যাংশন নেই। এ রকম অপারেশন মোটেই এথিক্যাল নয়, আমাদের প্রোফেশনাল কোডের একদম বাইরে।

বিঘোর বাবা বললেন, আরে রেখে দাও তোমার কোড। পণ্ডী যদি নিজের ধড় আর মুণ্ডু নিয়ে বেঁচে ওঠে তবে যে আবার রমাকান্তর কবলে পড়বে। মুণ্ডু বদল করলে এদের নব কলেবর হবে, কোনও গোলযোগের ভয় থাকবে না। আর একটা মস্ত লাভ এই হবে যে কখনও এদের ছাড়াছাড়ি হবে না। জটিরাম যদি আগে মরে তবে তার ধড় নিয়ে পণ্ডীর মুণ্ডু বেঁচে থাকবে। পণ্ডী যদি আগে মরে তবে তার ধড়টা জটির মুণ্ডু নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই

পণ্ডীটা অত্যন্ত চালাক, এর মাথা থেকেই এই বুদ্ধি বেরিয়েছে। জটিরাম হচ্ছে হাঁদারাম। কালই আমি ভৈরব মতে এদের বিয়ে দেব, আমার আশ্রমেই এরা বাস করবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, ধড় আর মুণ্ডু বদল হলে কে পণ্ডী কে জটিরাম তা স্থির হবে কি করে?

বিঘোর বাবা বললেন, মাথা হল উত্তমাঙ্গ। মাথা অনুসারেই লোকের নাম হয়, ধড় যারই হক।

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত জনান্তিকে বললেন, কিন্তু গণেশ আর দক্ষের বেলায় তা হয় নি।

যদু ডাক্তার বলতে লাগলেন, এর পর আর আপত্তি করা চলে না, অগত্যা খণ্ডযোজনের জন্য প্রস্তুত হলুম। অ্যানাস্থেটিক দরকার হল না, বিঘোর বাবা মাথায় আর গলায় হাত বুলিয়ে অসাড় করে দিলেন। কিন্তু ভোঁতা গুন-ছুঁচ আর খসখসে পাটের সুতলি দিয়ে চামড়া ফোঁড়া গেল না। বিঘোর বাবা বললেন, এই পিদিম থেকে রেড়ির তেল নিয়ে ছুঁচ আর সুতোয় বেশ করে মাখিয়ে নাও। তাই নিলুম। লুব্রিকেট করার পর কাজ সহজ হল, আধ ঘণ্টার মধ্যে মুণ্ডুর সঙ্গে ধড় সেলাই করে ফেললুম।

তার পর বিঘোর বাবাকে বললুম, এখন এদের শরীরে কিছু তাজা রক্ত পুরে দেওয়া দরকার, অভাবে পাঁচ শ সিসি গ্লুকোজ-স্যালাইন। কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে যোগাড় হবে কি করে? যদি নেহাতই বেঁচে থাকে তবে এর পর কিছুদিন লিভার এক্সট্রাক্ট, ব্লড্স পিল আর ভিগারোজেন খাওয়াতে হবে, নইলে গায়ে জোর পাবে না।

বিঘোর বাবা বললেন, ওসব ছাই ভস্ম চলবে না বাপু। এখন এরা সমস্ত রাত ঘুমুবে। কাল সকালে জেগে উঠলে ঝোলা গুড় দিয়ে

খানকতক রুটি পথ্য করবে। তার পর বেলা হলে পণ্ডী ভাত চড়িয়ে দেবে আর লঙ্কা-বাটা দিয়ে কাঁকড়া চচ্চড়ি রাঁধবে। তাতেই বলাধান হবে। জটিরাম আবার গাঁজা খায়। নয় রে জটে?

জটিরাম দাঁত বার করে বললে, হিঁ।

বিঘোর বাবা বললেন, বেশ তো, কাল সকালে আমার প্রসাদী ছিলিমে দু-এক টান দিস। এখন খাওয়া চলবে না, গলার জোড় পোক্ত হতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। এখন খেলে সেলাইএর ফাঁক দিয়ে সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। দেখ ডাক্তার, তোমাকে ফী কিছু দেব না, আজ তুমি যা দেখলে তারই দাম লাখ টাকা।

আমি উত্তর দিলুম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই বাবা। আমার চক্ষু কর্ণ সার্থক হয়েছে, অহংকার চূর্ণ হয়েছে, গা দিয়ে ঘাম ছুটছে, আগাপাস্তলা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। আমি ধন্য হয়ে গেছি। এখন অনুমতি দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাই, দু ডোজ ব্রোমাইড খেয়ে নার্ভ ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়ি। এই বলে প্রণাম করে সেই রাত্রেই কলকাতায় ফিরে এলুম।

ডাক্তার অশ্বিনী সেন বলেন, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

ডাক্তার হরিশ চাকলাদার বললেন, ফ্ল্যাবারগাস্টিং মিরাক্ল!

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, অতি খাসা। পরকীয়াপ্রেমের এমন পারফেক্ট পরিণাম বৈষ্ণব সাহিত্যেও নেই, আর সিম্বায়োসিসের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বায়োলজির কেতাবেও পাওয়া যায় না। আচ্ছা সার, নায়ক-নায়িকার তো একটা হিল্লে লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু রমাকান্তর কি হল?

ডাক্তার যদু গড়গড়ি বললেন, শুনেছি এক বছর পরে সে চুপি

চুপি বিঘোর বাবার আশ্রমে এসেছিল, কিন্তু জটি আর পঞ্চীকে দেখে ভূত-পেত্নী মনে করে তখনই ভয়ে পালিয়ে যায়। তার পর থেকে সে নিরুদ্দেশ।

—আহা, তার জন্য দুঃখ হয়, বেচারা খুন করেও বউকে শায়েস্তা করতে পারল না। নামটাই যে অপয়া, ডাইনে বাঁয়ে যে দিক থেকে পড়ুন পাবেন রমাকান্ত কামার। আমাদের সুবল বসুও তার দুমুখো নামের জন্য উন্নতি করতে পারছে না। আচ্ছা, তার পর আর কখনও আপনি পঞ্চী আর জটিরামকে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলুম। দু বছর পরে বিঘোর বাবা চিঠি লিখলেন, মাঘ সংক্রান্তির দিন জটি-পঞ্চীর ছেলের অন্নপ্রাশন, তুমি অবশ্যই আসবে। বাবার যখন আদেশ তখন যেতেই হল।

—কি দেখলেন গিয়ে?

—দেখলুম, বিঘোর বাবা ঠিক আগের মতন লাল চেলির জোড় পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানছেন, পঞ্চী তার মস্কিউলার মন্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে!

১৩৫৯

রটন্তীকুমার

স্কুলের ছুটির পর মানিক বললে, এই রটাই, আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ি আসবি, চায়ের নেমন্তন্ন।

রটাই বললে, আজ তোর জন্মদিন বুঝি?

—দূর বোকা, জন্মদিন বছরে ক বার হয়? এই তো সেদিন হয়ে গেল, ভোজ খেয়ে তোর পেটের অসুখ হল, মনে নেই?

—তবে কিসের নেমন্তন্ন ভাই?

—আজ বিকেলে দিদিমণির বর আসবে।

—তোর রুবি-দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

—দূর বোকা, বিয়ের এখন কিছুই ঠিক হয় নি। আজ খগেন-বাবু দিদিমণির সঙ্গে ভাব করতে আসবে। যদি খুব ভাব হয়ে যায় তবেই বিয়ে হবে।

রটাই সমঝদারের মতন বললে, অ। সে নিমন্ত্রণে যেতে সর্বদাই প্রস্তুত, উপলক্ষ্য যাই হক, ভাব বা আড়ি, বিয়ে বা বউভাত, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধ। মুড়ি-ছোলাভাজা, কেক-বিস্কুট, কচুরি-সন্দেশ, পোলাও-ক্যালিয়া, কিছুতেই তার আপত্তি নেই।

বিকালে পৌনে পাঁচটার সময় রটাই যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন হয়ে মানিকদের বাড়ি যাচ্ছে এমন সময় তার বড়দিদি বললে, এই রটাই, এই টিফিন ক্যারিয়ারটা নে, মানিকের মাকে দিবি। সাবধানে নিয়ে যাবি, ফেলে দিস নি যেন। খালি হলে আসবার সময় ফেরত আনবি।

টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে রটাই বললে, উঃ কি ভারী।

কি কি আছে বড়দি? বাদামের নিমকি আর মাছের কচুরি আর মাংসের প্যাটি আর পেস্তার বরফি আর ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সব আছে। মানিকদের বাড়ি গিয়ে তো দেখতেই পাবি, খেতেও পাবি।

—ওদের বাড়িতে খাওয়ানো হবে তো তুমি খাবার করে দিলে কেন? বল না দিদিমণি!

—আঃ, তোর অত খোঁজে দরকার কি। মানিকের মা তৈরি করে দিতে বলেছেন তাই দিয়েছি।

মানিকদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। সেখানে গিয়ে মানিকের মাকে টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে রটাই বললে, কই মাসীমা, রুবি-দির জামাইবাবু আসে নি?

মানিকের মা বললেন, ছেলের কথার ছিরি দেখ! দশ বছরেব ঢেঁকি, এখনও বুদ্ধি হল না। ও তো পানুর বন্ধু খগেন, চা খাবাব জন্যে আসতে বলেছি। খবরদার রটাই, তার সামনে অসভ্যতা করিস নি যেন।

সজোরে মাথা নেড়ে রটাই জানালে যে অসভ্যতা করবার ছেলে সে নয়। মানিক তাকে বললে, দাদার সঙ্গে খগেনবাবু সাড়ে পাঁচটায় আসবে, ততক্ষণ ও ঘরে ক্যারম খেলবি আয়।

যথাকালে মানিকের দাদা পানু বা পান্নালালের সঙ্গে শ্রীমান খগেনের আগমন হল। সুশ্রী চেহারা, শৌখিন পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় যে বড়লোক, নিজের মোটরে এসেছে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, তার বাপের অভ্র আর কয়লার ব্যবসায়ে কাজ করছে। রূপে

গুণে বিদ্যায় টাকায় এমন পাত্র দুর্লভ, মানিকের মা তাকে জামাই করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি তাঁর বড় ছেলে পানুর সঙ্গে খগেনের আলাপ হয়েছে, মায়ের অনুরোধে পানু তার বড়-লোক বন্ধুকে ধরে এনেছে।

চায়ের টেবিলে ছ জন বসেছেন—প্রধান অতিথি খগেন, প্রধান আকর্ষণ রুবি, প্রধান বক্তৃী তার মা, দুই ভাই পানু আর মানিক, এবং মানিকের বন্ধু রটাই। বাড়ির কর্তা অনেক দেরিতে অফিস থেকে ফিরবেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করেছেন।

যথারীতি হালকা আলাপ আর অকারণ হাসি চলতে লাগল। রুবি গোটাকতক গান গাইলে। তার মা বললেন, জান বাবা খগেন, ইনফ্লুএঞ্জা হবার পর থেকে রুবির গলাটা একটু ধরে গেছে, নইলে বুঝতে কি চমৎকার গায়। রীতিমত ওস্তাদের কাছে শেখা কিনা। এই ছবিটি দেখ, রুবি এঁকেছে। নাম দিয়েছে—মত্ত দাদুরী। আকাশে ঘনঘটা, সরোবর জলে টইটুম্বুর, তাতে রক্ত করবী ফুটেছে—

রুবি বললে, রক্ত কুমুদ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রক্ত কুমুদ ফুটেছে। সরোবরের তীরে সারি সারি দাদুরীরা সব বসে আছে, গলা ফুলিয়ে প্রাণপণে ডাকছে, তাদের ছাতি যাওত ফাটিয়া। অবনী ঠাকুরকে দেখাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি রইলেন না তো। আর এই দেখ, কি সব সুন্দর সুন্দর বুনেছে। এই টেবিল ক্লথটি হচ্ছে অজণ্টা প্যাটারেন, চারিদিকে পদ্মফুল আর মধ্যিখানে একটি মুরগি। খুব এক্সেলেণ্ট করেছে না? ওরে পানু, খগেনের ছাতির মাপটা নে তো, রুবি ওর জন্যে একটা ভেস্ট বুনে দেবে। জান খগেন, সবাই বলছে, মেয়ের যখন অত রূপ তখন মিস ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে দাঁড়াচ্ছে না কেন। আমার

খুব মত ছিল, কিন্তু ওর বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। মস্ত বড় অফিসার হলে কি হবে, জন্ম যে অজ পাড়া গাঁয়ে।

মানিক তার ভাবী ভগিনীপতিকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করতে লাগল।—আপনার এই ঘড়িটায় দম দিতে হয় না বুঝি? এই ফাউণ্টেন পেনটার দাম কত? মোটর গাড়িতে রেডিও বসান নি কেন? আপনার সিগারেট কেসটা দেখান না, বিলাতে কিনেছেন বুঝি? আপনার ক্যামেরা আছে? আমাদের ছবি তুলে দেবেন? ইত্যাদি।

খগেনকে রটাইএর খুব পছন্দ হল। সে তিন-চার বার আলাপের চেষ্টা করলে, কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে রুবি আর তার মা কটমট করে তার দিকে তাকালেন, অগত্যা সে চুপ করে খাবারের অপেক্ষায় বসে রইল। আজ রটাইকে নিমন্ত্রণ করতে রুবির মায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে খাবার বয়ে আনবে, তাদের বাড়িতে চাকরের অভাব, সেজন্য নেহাত চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাকে খেতে বলা হয়েছে।

অবশেষে খাবার এল। বাড়ির চাকর একটা ময়লা হাফপ্যাণ্টের ওপর ফরসা হাত-কাটা শার্ট পরে খাবার আর চায়ের ট্রে একে একে নিয়ে এল। সে মেদিনীপুরের লোক, কিন্তু রুবির মা তাকে 'বোই' সম্বোধন করে হিন্দীতে ফরমাশ করতে লাগলেন। রুবি পরিবেশন করলে। রটাই সব অনাদর ভুলে গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে খেতে লাগল।

রুবির মা বললেন, কই, কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা খগেন, আরও দুটো কচুরি আর প্যাটি দিই। বল্ না রে রুবি ভাল করে খেতে, এত খেটে সব তৈরি করলি, না খেলে মেহনত সার্থক হবে কেন। সব জিনিস কেমন হয়েছে বাবা?

খগেন বললে, অতি চমৎকার হয়েছে, এমন খাবার কোথাও খাই নি।

উৎফুল্ল হয়ে রুবির মা বললেন, সত্যি? তোমার জন্যে রুবি সমস্ত নিজের হাতে তৈরি করেছে, ওর রান্নার হাত অতি চমৎকার।

রটাইএর মুখ কচুরিতে বোঝাই, তবু সে চুপ করে থাকতে পারল না, মুখের ডেলাটা এক পাশে ঠেলে রেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, বা রে, ওসব তো আমার বড়দি করেছে।

রুবির মা গর্জন করে বললেন, চুপ কর্ অসভ্য ছেলে! যা জানিস না তা বলতে আসিস কেন?

কচুরি-পিণ্ড কোঁত করে গিলে ফেলে রটাই বললে, বাঃ, আমিই তো বাড়ি থেকে সব নিয়ে এলুম।

রুবির মুখের তিন স্তর গোলাপী প্রলেপ ভেদ করে বেগনী আভা ফুটে উঠল। তার মা রেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পানু, এই হতভাগা হিংসুটে ছোঁড়াটাকে মানিকের পড়বার ঘরে রেখে আয় তো। মিথ্যে কথাব ঢেঁকি, ভদ্রসমাজে কখনও মেশে নি, কেবল বড়াই কবতে জানে। তখনই বারণ করেছিলুম ওটাকে আনিস নি, তা মানুকে তো শুনবে না, ভারী গুণের বন্ধু যে।

পান্নালাল রটাইএর হাত ধবে হিড়হিড় কবে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, তোর তো খাওয়া হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যা রটাই।

রটাই বললে, খাওয়া তো কিছুই হয় নি, এখনও প্যাটি নিমকি বরফি ল্যাংচা আর চা বাকী রয়েছে। খালি হলে টিফিন ক্যারিয়ারটাও তো নিয়ে যেতে হবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি সব এনে দিচ্ছি। তুই এখানে একলাটি বসে চুপচাপ খেয়ে নিবি, তার পর সোজা বাড়ি চলে যাবি, কেমন?

রটাই ঘাড় নেড়ে জানালে যে তাতেই সে রাজী। অত ধমক

খাওয়ার পরেও তার খিদে ঠিক আছে, কিন্তু পান্নালাল তাকে যা এনে দিলে তা যথেষ্ট নয়, যেটা আসল জিনিস, ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা, তাই তাকে দেওয়া হয় নি। যা জুটল তাই সে অনেকক্ষণ ধরে খেলে, তার পর কাকেও কিছু না বলে বাড়ি রওনা হল।

রটাইএর বেফাঁস কথার ফলে ও ঘরের চায়ের আসরটি একবারে মাটি হয়ে গেল, আলাপ মোটেই জমল না, যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন তাও কিছুমাত্র অগ্রসর হল না। রুবি গোঁজ হয়ে বসে রইল, তার মুখ থেকে হাঁ-না ছাড়া কোনও কথা বেরুল না। ওই বজ্জাত রটাইটাকে সে যদি হাতে পায় তো কুচি কুচি করে কেটে ফেলে। আর মায়েরই বা কি আক্কেল, তাঁর মেয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরি করেছে এ কথা ইশারায় বললেই তো চলত, ঢাক পিটিয়ে জানাবার কি দরকার ছিল? কেবল বকবক করে এলোমেলো কথা বলতে পারেন, ওই শয়তান ছোঁড়াটা যে জলজ্যান্ত সামনে বসে রয়েছে সে হুঁশই হল না।

অপ্রিয় ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য রুবির মা অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন, পান্নালালও তার বন্ধুকে খুশী করবার জন্য নানা রকম রসিকতা করতে লাগল। খগেন হাসিমুখে অল্পস্বল্প কথা বলে কোনও রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখলে। খানিক পরে সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আজ উঠি মাসীমা, আর এক জায়গায় দরকার আছে। ওঃ, যা খাইয়েছেন তা হজম হতে তিন দিন লাগবে।

রুবির মা বললেন, কি আর খেয়েছ বাবা, ও তো কিছুই নয়। আবার এসো, সকালে বিকেলে সন্ধ্যায় যখন তোমার সুবিধে। তুমি তো ঘরের ছেলে, যা ঘরে থাকবে তাই খাবে।

আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ঝুঁকে নমস্কার করে খগেন বিদায় নিলে।

কিছু দূর গিয়েই সে দেখতে পেলে, একটি ছেলে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে চলেছে। গাড়ি থামিয়ে খগেন ডাকল, ও খোকা! রটাই থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার নাম কি ভাই?

—রটাই।

—এস, গাড়িতে ওঠ, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

রটাই উঠে বসল। খগেন বললে, তুমি বুঝি খুব রটিয়ে বেড়াও তাই রটাই নাম?

রটাই উত্তর দিলে, দূর, তা কেন। আমার ভাল নাম শ্রীরটন্তী-কুমার রায়চৌধুরী, আমি রটন্তীপুজোর দিন জন্মেছিলুম কিনা তাই আমার দাদামশাই ওই নাম রেখেছেন। আর বড়দির নাম জয়ন্তীমঙ্গলা, ছোড়দির নাম প্রত্যঙ্গিরা।

—উঃ, তোমাদের খুব জাঁকালো নাম দেখছি। বাড়ি কত দূরে? কোন্ ক্লাসে পড়? বাড়িতে কে কে আছেন?

রটাই জানালে, তার বাড়ি বেশী দূরে নয়। সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। বাবা রেলে কাজ করেন, বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়, মাঝে মাঝে আসেন। বাড়িতে আছেন তার মা, দুই দিদি আর সে নিজে। দিদিদের এখনও বিয়ে হয় নি। তা ছাড়া ভুঁদো কুকুর আর রূপসী বেরাল আছে। ভুঁদোটা ভীষণ লোভী, সেদিন মালপো চুরি করে খেয়েছিল। কিন্তু রূপসী হচ্ছে ভদ্র মহিলা, খেতে না বললে খায় না। শীঘ্রই তার বাচ্চা হবে, খগেনের যদি দরকার থাকে তবে যতগুলো ইচ্ছে নিতে পারে।

রটাই মোটেই লাজুক নয়, অপরিচয়ের জন্য যেটুকু সংকোচ ছিল

তা অল্পক্ষণ আলাপে সহজেই কেটে গেল। সে প্রশ্ন করলে, রুবি-দির সঙ্গে আপনার ভাব হল?

খগেন হেসে বললে, কই আর হল। চায়ের টেবিলে তুমি যে বোমা ছুড়েছ তাতে তো সবাইকার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

—আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন? আমার কিন্তু কিছু দোষ নেই।

—না না, তুমি খুব ভাল ছেলে, শুধু একটু কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, যা বলতে নেই তাই বলে ফেলেছ।

—আমি তো সত্যি কথাই বলেছি। আমার বড়দির কাছেই শুনেছি যে মানিকের মা বলেছিলেন তাই খাবার তৈরি করে দিয়েছে।

—না হে না। তুমি কিছু জান না, রুবি-দিই সব নিজের হাতে তৈরি করেছে।

—কখ্খনো নয়, আপনিই কিছু জানেন না। রুবি-দি শুধু আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ করতে পারে। ব্যাঙের ছবিটা তার আঁকা বটে, কিন্তু সেই যে পদ্মফুল আর মুরগির ছবিওয়ালা টেবিল ক্লথটা আপনাকে দেখিয়েছে সেটা রুবি-দি তৈরি করে নি। মানিকদের বাড়ির পাশের বাড়িতে আমাদের ক্লাসের কেল্টে থাকে, তারই পিসীমা ওটা বানিয়েছে। আমি ওদের বাড়ি যাই কিনা, তাই সব জানি।

—উঃ, তুমি অতি সাংঘাতিক ছেলে, আঁফাঁ তেরিব্‌ল! কিন্তু তোমার সেই জয়ন্তীমঙ্গলা দিদিমণিই যে খাবার তৈরি করেছেন তার প্রমাণ কি? তোমাদের বাড়ি গেলে আমাকে ওই রকম খাওয়াতে পারবে?

—খুব পারব, না পারলে আমার দু কান মলে দেবেন।

—আর যদি পার তবে তুমি আমার দু কান মলে দেবে নাকি?

—দূর, আপনি যে বড়। যদি হেরে যান তো আমাকে ফাইন দেবেন।

—কত ফাইন দিতে হবে?

একটু ভেবে রটাই বললে, একটা টাকা দেবেন।

—মোটে এক টাকা দিলেই হবে?

—দু টাকা যদি দেন তো আরও ভাল, আমার দু কানের বদলে আপনার দু টাকা। এখুনি চলুন না আমাদের বাড়ি।

—পাগল নাকি! এই মাত্র এত খেয়ে আবার তোমাদের বাড়িতে খাব কি করে?

—আচ্ছা, পরশু রবিবার, সেদিন বিকেলে ঠিক আসবেন বলুন।

—তুমিই বাড়ির কত্তামশাই নাকি? ওখানে কেউ তো আমাকে চেনেন না, যদি গায়ে পড়ে খেতে যাই তবে যে আমাকে অসভ্য হ্যাংলা মনে করবেন।

—ইশ, মনে করলেই হল! আমি তো আপনাকে চিনি, আমার কথায় যদি আপনি আসেন তবে কেউ কিচ্ছু মনে করবে না। কিন্তু দেখুন, আমরা হচ্ছি গরিব, অত রকম খাবার হবে না। মানিকের মা মাছ মাংস পেস্তা বাদাম এই সব পাঠিয়ে দিয়েছিল তাই বড়দি করে দিয়েছে। রবিবার বিকেলে ঠিক আসবেন কিন্তু।

—বেশ, তুমি যখন নিমন্ত্রণ করছ তখন যাব। কিন্তু খাবার মোটেই তৈরি করাবে না, শুধু চা।

—বাঃ, তা হলে আপনার বিশ্বাস হবে কি করে?

—কেউ খাবার করতে জানে কি জানে না তা আমি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি। আর একটা কথা।—ওখানে যে কাণ্ডটা

বাধিয়েছিলে তা যেন তোমাদের বাড়িতে ব'লো না, তা হলে আমি ভারী লজ্জায় পড়ব। আর দেখ, মানিককে সেদিন ডেকো না যেন।

—নাঃ, মানিকের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি। আজ অতক্ষণ তার পড়বার ঘরে একলাটি রইলুম একবারও এল না।

—আড়ি করবে কেন, শুধু পরশু দিন তাকে তোমাদের বাড়িতে এনো না। আচ্ছা রটন্তীকুমার, তোমার বড়দির তো খুব জমকালো নাম, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী, খাবার তৈরিতেও ওস্তাদ, তিনি দেখতে কেমন?

—খুব সুন্দর। রুবি-দি এক ঘণ্টা ধরে রং মেখে তবে ফরসা হয়, কিন্তু বড়দিকে কিছুই করতে হয় না। আর তার গানের কাছে রুবিদির গান যেন কাগ ডাকছে। কিন্তু বললেই বড়দি গায় না, আপনি যদি খুব অনেক বার অনেক করে বলেন তবেই গাইবে। আর জানেন, বড়দি এম এ পাস, ছোড়দি আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে, আর রুবি-দি তিন বার ফেল করেছে। বড়দির শীগ্‌গির একটা চাকরি হবে। দাদামশাই কি বলেন জানেন? লক্ষ্মী আর সরস্বতী আর অন্নপূর্ণা একসঙ্গে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা হয় বড়দি হচ্ছে তাই।

—আর তোমাকে কি বলেন?

—হিহি করে হেসে রটাই বললে, সে ভারী বিশ্রী। আমাকে বলেন, ন্যাজ-কাটা বীর হনুমান।

—বিশ্রী কেন, হনুমানের মতন সচ্চরিত্র দেবতা কটা আছে? আমার কি মনে হয় জান? তুমি হচ্ছ নারদ মুনি, পাক্কা দালাল, মানিকের মা তোমার কাছে একবারে খুকী, কম্‌পিটিশনে দাঁড়াতেই পারেন না। এইটে তোমাদের বাড়ি তো? আচ্ছা, এস ভাই, পরশু আবার দেখা হবে।

বাড়ি এসে রটাই বললে, দিদিমণি, মস্ত খবর, খগেনবাবুকে নেমন্তন্ন করেছি, পরশু বিকেলে চা খেতে আসবেন।

জয়ন্তী বললে, খগেনবাবু আবার কে?

—ওই যে, আজ যিনি মানিকদের বাড়ি চা খেলেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। উঃ, মস্ত বড় মোটরকার! তোমাকে বেশী কিছু করতে হবে না, শুধু মাছের কচুরি, মটন প্যাটি, ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা আর চা।

জয়ন্তী তার মাকে ডেকে বললে, তোমার খোকার আক্কেল দেখ মা। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে কোথাকার কে খগেনবাবু না বগেনবাবুকে নেমন্তন্ন করেছে। আবার আমাকে খাবারের ফরমাশ করছে। খাবার খুব সস্তা, না? তার খরচ তুই দিবি?

রটাই হাত নেড়ে বললে, সে তুমি কিছু ভেবো না দিদিমণি, আমি তোমাকে দুটো টাকা দেব। কিন্তু আজ নয়, সেই পরশুর পরে তরশু দিন দেব।

—তুই টাকা পাবি কোথা থেকে? মানিকের মায়ের কাছ থেকে মুটেভাড়া আদায় করবি নাকি?

—ধেৎ। তোমাকে সে পরে বলব, এখন বলতে মানা।

—অচেনা উটকো লোকের জন্য আমি খাবার করতে পারব না।

—অচেনা কেন হবে, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে যে। তাঁর নিজের মোটরে আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।

—তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেছিস বুঝি?

রটাইএর মা বললেন, তা খোকা যখন নেমন্তন্ন করে ফেলেছে তখন আসুক না খগেনবাবু। কিছু খাবার তৈরি করিস, বাজারের জিনিস দেওয়া তো ভাল দেখাবে না।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেল বেলায় খগেন রটাইদের বাড়ি উপস্থিত হল। বসবার ঘরের সজ্জা অতি সামান্য, শুধু তক্তাপোশের ওপর ফরাশ পাতা। কিন্তু আদরের ত্রুটি হল না, রটাইএর মা খগেনের সঙ্গে আত্মীয়ের মতন আলাপ করলেন। আজকের আসরে প্রধান বক্তা রটাই, সে তার নতুন বন্ধুকে নিজের সম্পত্তির মতন দখল করে রইল এবং একটানা কথা বলে যেতে লাগল।

একটু পরে জয়ন্তী আর তার ছোট বোন খাবার নিয়ে এল। খগেন বললে, রটন্তীকুমার, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়, আমি বারণ করেছিলুম তবু তুমি এতসব খাবার করিয়েছ।

রটাই বললে, বাঃ, শুধু বুঝি আপনার জন্যে বড়দি খাবার করেছে, আমিও খাব যে। সেদিন মানিকদের বাড়ি আমার তো ভাল করে খাওয়াই হয় নি।

জয়ন্তী বললে, পেটুক কোথাকার!

কচুরি চিবুতে চিবুতে খগেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রটাই চুপি চুপি বললে, এখন আপনার বিশ্বাস হল তো? দুও, দু টাকা হেরে গেলেন! আজই দেবেন কিন্তু। দেখুন, এইবারে দিদিমণিকে গান গাইতে বলুন না।

খগেন চুপি চুপি উত্তর দিলে, উঁহু, আজ নয়, আর এক দিন হবে এখন।

রটাইএর মা বললেন, এই খোকা, ওঁকে বিরক্ত করছিস কেন, খেতে দিবি না?

জয়ন্তী বললে, দেখ না, জোঁকের মতন ধরে আছে।

খগেন সহাস্যে বললে, না না, বিরক্ত করে নি। ও আমাকে খুব স্নেহ করে, যদিও মোটে দশ মিনিটের পরিচয়। রটাই হচ্ছে অত্যন্ত দিদিভক্ত, আমার কানে কানে আপনার একটু গুণগান করছিল।

জয়ন্তী বললে, ভারী অসভ্য হয়েছিস তুই।

রটাই বললে, কই আবার অসভ্য হলুম! শুধু বলছিলুম, তুমি খুব ভাল খাবার করতে পার। তা বুঝি অসভ্যতা হল? আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খাবার পার না, গান পার না, সেতার পার না, মোটেই কিচ্ছু পার না। জান বড়দি, খগেনবাবুর মোটরে কিচ্ছু শব্দ হয় না, ঝাঁকুনিও লাগে না।

খগেন বললে, চল না, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। তার পর তোমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাব এখন।

মহা উল্লাসে রটাই হনুমানের মতন হুপ শব্দ করে গাড়িতে চড়ে বসল। তার মা আর দিদিদের কাছে বিদায় নিয়ে এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খগেন চলে গেল।

যেতে যেতে রটাই খগেনকে বললে, দেখুন, রুবি-দি হচ্ছে একদম বাজে, তার মা আরও বাজে। আপনি আমার বড়দির সঙ্গেই ভাব করুন।

খগেন বললে, নেহাত বাজে কথা বল নি রটাই। কেমন করে ভাব করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দিতে পার? ওঃ হো, তোমার বাজি জেতার কথা ভুলে গিয়েছিলুম, এই নাও।

টাকা দুটো পকেটে পুরে রটাই বললে, আমরা ইস্কুলে কি করে ভাব করি জানেন? মনে করুন একটা নতুন ছেলে এসেছে। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই, তোর নাম কিরে? সে বললে, হাবলু। আমি তার পিঠ চাপড়ে বললুম, হাবলু, তোর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল, এই নে দুটো লাল কাঁচের গুলি। আবার আড়ি করা

আরও সহজ, দাড়িতে তিন বার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বলতে হয়—আড়ি আড়ি আড়ি।

—খাসা নিয়ম। তোমার রুবি-দির সঙ্গে ওই রকমে ভাব হতে পারে, তিনি মুখিয়ে আছেন কিনা। কিন্তু তোমার জয়ন্তীমঙ্গলা দিদিমণিটি অন্য রকমের, পিঠ চাপড়ে ভাব করা যাবে না। তাঁর মতন রমণীর মন সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন। যা হক, আমি চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু হাজার বছর সাধনা করা তো চলবে না, আমার বাবা মা বিয়ের জন্যে তাড়া লাগিয়েছেন যে। বলেছেন, যাকে খুশি বিয়ে কর, কিন্তু বোকার মতন পছন্দ ক'রো না, আর বেশী দেরি না হয়; মাঘ মাসে আমরা তীর্থভ্রমণে বেরুব, তার আগেই বিয়ে দিতে চাই। দেখি, তার মধ্যে কিছু করতে পারি কিনা। শোন রটাই, তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ, তোমার দিদিমণিকে ভাব করবার জন্য খুঁচিও না যেন।

—উ রে বাবা! তা হলে আমার পিঠে দমাদম কিল মারবে।

—আমাকেও মারবে না তো?

—নাঃ, আপনাকে কিচ্ছু বলবে না।

বেড়ানো শেষ হলে রটাইকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে খগেন চলে গেল। তার পর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এক মাসের মধ্যে একবার মানিকদের বাড়ি এবং তিন বার রটাইদের বাড়ি গেল। খগেন বড় মুশকিলে পড়ল, রুবির মা বার বার তাকে আসবার জন্য বলে পাঠাচ্ছেন, এদিকে রটাইএর আবদার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেমানুষের কথা ঠেলা যায় না, অগত্যা রটাইদের বাড়িতে খগেন ঘন ঘন যেতে লাগল।

দিন কতক পরে রটাই জিজ্ঞাসা করলে, ভাব হল?

খগেন বললে, ধীরে রটন্তীকুমার, ধীরে। পণ্ডিতরা বলেন, পথ হাঁটা, কাঁথা সেলাই, আর পাহাড় টপকানো শনৈঃ শনৈঃ মানে আস্তে আস্তে করতে হয়। ভাব করাও সেই রকম, তাড়া হুড়ো চলে না। বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করতেন তবে এত দিন কোন্ কালে ভাব হয়ে যেত। তা তো তিনি করবেন না, আবার তাঁর টাকাও বিস্তর আছে, সব আমিই পাব। এই হয়েছে বিপদ।

—বিপদ কেন? টাকা থাকা তো ভালই, কত রকম মজা করা যায়, আইসক্রীম, চকোলেট, মোটর গাড়ি, দম দেওয়া ইঞ্জিন, ব্যাডমিণ্টন, পিংপং, লুডো, আরও কত কি।

—তোমার দিদি যে তা বোঝেন না। তাঁর বিশ্বাস, সমান সমান না হলে ভাব করা ঠিক নয়। আমি তাঁকে বলি, তুমিই বা কিসে কম? দেখতে আমার চাইতে ঢের ভাল, বিদ্যেতেও বেশী। তোমার দাদা-মশাই তো বলেই দিয়েছেন তুমি হচ্ছ লক্ষ্মী সরস্বতী আর অন্নপূর্ণার অ্যাভারেজ। তুমি চমৎকার গাইতে পার, আমার গলা টিপলেও সারেগামা বেরুবে না। তুমি হরেক রকম খাবার করতে জান, মায় ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা, আর আমি পাঁউরুটি কাটতেও জানি না। তবু তোমার দিদিমণি খুঁতখুঁত করছেন। যা হক, তুমি ভেবো না রটাই, সব ঠিক হয়ে যাবে, দিন কতক সবুর কর।

পাঁচ দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করলে, ভাব হল?

খগেন বললে, আর একটু দেরি আছে।

রটাই বিরক্ত হয়ে বললে, এত দিনেও ভাব হল না? আমার সঙ্গে তো আপনার এক মিনিটে ভাব হয়েছিল। বড়দির ভারী অন্যায়, আপনি তাকে বলুন, তিন দিনের মধ্যে যদি ভাব না করে তবে আড়ি হয়ে যাবে।

—ওহে রটন্তীকুমার, ধৈর্যং রহু ধৈর্যং। আমি যদি লঙ্কেশ্বর রাবণ হতুম তো আল্টিমেটম দিতুম যে তিন দিনের মধ্যে ভাব না করলে তাঁকে কাটলেট বানিয়ে খেয়ে ফেলব। কিন্তু তা তো পারব না। হুড়ো লাগালে তোমার দিদিমণি ভড়কে যাবেন, হয়তো রেগে গিয়ে তাঁর কোনও ক্লাসফ্রেন্ড তরুণকুমার কি করুণকুমারের সঙ্গেই ভাব করে ফেলবেন। আমিও তখন মরিয়া হয়ে রুবি-দির কাছেই যাব—

তিড়বিড় করে হাত পা ছুড়ে রটাই বললে, খবরদার যাবেন না বলছি! বেশ, আরও কিছু দিন দেখুন।

তিন দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করলে, হল?

খগেন বললে, এইবারে হব হব। তোমার দিদিমণিকে বলেছি, টাকার জন্য ভাবছ কেন, ও তো বাবার টাকা। আমার হাতে এলে তিন দিনে ফুঁকে দেব। যদি মামুলী উপায় পছন্দ না কর তবে হাসপাতাল আছে, ইস্কুল কলেজ আছে, রামকৃষ্ণ মিশন গৌড়ীয় মঠ আছে, হরেক রকম গুরু মহারাজের আখড়া আছে, যেখানে বলবে দিয়ে দেব। তার পর হাত খালি করে কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে, সেই রকম ফুর্তিতে থাকা যাবে।

—কিন্তু মোটর কার তো চাই?

—চাই বইকি। তাতে চড়েই তো মুষ্টিভিক্ষা করতে বেরুব, খুদ-কুঁড়ো যা আনব তাই দিয়ে তোমার দিদি পোলাও রাঁধবেন। আর দেখ, আমাদের কুটীরের সঙ্গে লাগাও একটা মস্ত তিন-তলা ধর্মশালা থাকবে, তুমি আর মানিক কেল্টে ভুল্টু হাবলু প্রভৃতি তোমার বন্ধুবর্গ মাঝে মাঝে এসে সেখানে বাস করবে। তার সামনেই একটি চমৎকার খেলার মাঠ—

—উঃ কি মজা! আর দেরি করবেন না, চটপট ভাব করে ফেলুন।

দেরি হল না। তিন দিন পরে ইস্কুলে মানিক বললে, হ্যাঁরে রটাই, খগেনবাবু নাকি খালি খালি তোদের বাড়ি যায়? রটাই সগর্বে উত্তর দিলে, যাবেই তো, বড়দির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে যে।

কিন্তু এই ভাব হওয়ার ফলে রটাইদের বাড়ির লোকের সঙ্গে মানিকদের বাড়িব লোকের ভীষণ আড়ি হয়ে গেল। রুবির মা কেল্টের পিসীকে বললেন, উঃ, কি বেহায়া গায়ে পড়া মেয়ে ওই জয়ন্তীটা,—জানা নেই শোনা নেই একটা বজ্জাত বিশববকাট ছোকবা খগেন, তাকেই ভেড়া বানালে গা!

কেল্টের পিসী বললেন, মুখে আগুন, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

জয়ন্তীর বিয়েতে মানিকদের বাড়ির কেউ এল না, কিন্তু কেল্টেদেব সবাই এল, মায় তার পিসী। তিনি ঝাঁটা নিয়ে যান নি, আঁচলের ভেতর একটা থলি নিয়ে গিয়েছিলেন। পিসী অল্পে তুষ্ট, শুধু ভাঁড়ার থেকে গণ্ডা পাঁচেক কড়া-পাক সন্দেশ আর জয়ন্তীর উপহার-সামগ্রী থেকে খান দুই রসাল গল্পের বই সরিয়েছিলেন।

১৩৫৯

অগস্ত্যদ্বার

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পাটনায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি ছিল। পুরনো শহরের গুলজারবাগ মহল্লা থেকে বাঁকিপুরের জজ-আদালত পর্যন্ত সিংগল লাইনে গাড়ি চলত। দু দিক থেকে যাতায়াতের বাধা যাতে না হয় তার জন্য এক মাইল অন্তর লুপ ছিল, অর্থাৎ লাইন থেকে একটা শাখা বেরিয়ে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে আবার লাইনের সংগে মিশত। প্রত্যেক গাড়ি লুপের কাছে এসে থামত এবং উলটো দিকের গাড়ি এলে লুপে গিয়ে পথ ছেড়ে দিত। কিন্তু সব সময় এই ব্যবস্থায় কাজ হত না। একটা গাড়ি লুপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, আধ ঘণ্টা হয়ে গেল তবু ও দিকের গাড়ির দেখা নেই। যাত্রীরা অধীর হয়ে বললে, চালাও গাড়ি, আর আমরা সবুর করতে পারি না। গাড়ি অগ্রসর হল, কিন্তু আধ মাইল যেতে না যেতে ও দিকের গাড়ি এসে পথরোধ করলে। তখন দুই তরফের গালাগালি শুরু হল। আরে গাধা তুই লুপে সবুর করিস নি কেন? আরে উল্লু তুই এত দেরি করলি কেন? যাত্রীরাও ঝগড়ায় যোগ দিলে, দুই গাড়ির চারটে ঘোড়াও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পা তুলে চিঁহিহি করতে লাগল। তামাশা দেখবার জন্য রাস্তায় লোক জমে গেল, ছোকরার দল হাততালি দিয়ে চেঁচাতে লাগল—হী লব লব লব। অবশেষে একজন যাত্রী বললে, ঝগড়া এখন থাক, গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা কর। তখন দুই গাড়ির ঘোড়া খুলে পিছনে জোতা হল, এ গাড়ির যাত্রীরা ও গাড়িতে উঠল, দুই গাড়িই যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে চলল। গাড়ি বদলের ফলে যাত্রীরাও তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেল।

এই ধরনের কিন্তু অতি গুরুতর একটা বিভ্রাট পুরাকালে ঘটেছিল। তারই ইতিহাস এখন বলছি।

একদা সত্যযুগে বিন্ধ্য গিরির অত্যন্ত অহংকার হয়েছিল, চন্দ্র-সূর্যের পথরোধ করবার জন্য সে ক্রমশ উঁচু হতে লাগল। তখন অগস্ত্য মুনি এসে তাকে বললেন, আমি দক্ষিণে যাত্রা করব, আমাকে পথ দাও। বিন্ধ্য বিদীর্ণ হয়ে একটি সংকীর্ণ পথ করে দিলে, যার নাম অগস্ত্যদ্বার। সেই গিরিসংকটের ও পারে গিয়ে বিন্ধ্যের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে অগস্ত্য বললেন, বৎস বিন্ধ্য, এ হচ্ছে কি, তুমি যে বাঁকা হয়ে বাড়ছ, ওলন ঠিক নেই, কোন্ দিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। আমি ফিরে এসে শিখিয়ে দেব কি করে খাড়া হয়ে বাড়তে হয়, তত দিন তুমি আর উঁচু হয়ো না। বিন্ধ্য বললে, যে আজ্ঞে। তার পর অনেক কাল কেটে গেল কিন্তু অগস্ত্য ফিরলেন না। তখন বিন্ধ্য রেগে গিয়ে শাপ দিলে, এই অগস্ত্যদ্বারে যারা দু দিক থেকে মুখোমুখি প্রবেশ করবে তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হবে। শাপের কথা একজন শিষ্যের মুখে শুনে অগস্ত্য বললেন, ভয় নেই, কিছু দিন পরেই বুদ্ধি ফিরে আসবে।

উক্ত পৌরাণিক ঘটনার বহু কাল পরের কথা বলছি। তখনও বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন, সেখানে লোকালয় ছিল না, কোনও রাজার শাসনও ছিল না। এই বিশাল নো ম্যান্স ল্যান্ডের উত্তরে কলিঞ্জর রাজ্য। কলিঞ্জরের দক্ষিণে অরণ্য, তার পর দুর্লঙ্ঘ বিন্ধ্য গিরি, তার পর আবার অরণ্য, তার পর বিদর্ভ রাজ্য। কলিঞ্জরের রাজা কনকবর্মা আর বিদর্ভের রাজা বিশাখসেন দুজনেই তেজস্বী যুবক। তাঁদের মহিষীরা মামাতো-পিসতুতো ভগ্নী।

কলিঞ্জরপতি কনকবর্মা তাঁর রাজ্যের দক্ষিণস্থ বনে মাঝে মাঝে মৃগয়া করতে যেতেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা হল বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে গিয়ে শম্বর হরিণ শিকার করবেন। তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্য কহোড়ভট্টের সঙ্গে রথে চড়ে যাত্রা করলেন, পিছনে রথী পদাতি গজারোহী অশ্বারোহী সৈন্যদল চলল।

দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে বিদর্ভরাজ বিশাখসেনেরও ইচ্ছা হল বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরবর্তী অরণ্যে গিয়ে ব্যাঘ্রভল্লুকাদি বধ করবেন। তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্য বিড়ঙ্গদেবের সঙ্গে রথারূঢ় হয়ে যাত্রা করলেন, চতুরঙ্গসেনা পিছনে পিছনে গেল।

বিন্ধ্যপর্বতমালা ভেদ করে একটি পথ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গেছে। এই পথটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু মাঝামাঝি এক স্থানে পূর্বোক্ত অগস্ত্যদ্বার নামক গিরিসংকট আছে, তা এত সংকীর্ণ যে দুটি রথ পাশাপাশি যেতে পারে না।

কলিঞ্জরপতি কনকবর্মা অগস্ত্যদ্বারের উত্তর প্রান্তে এসে দেখলেন রাজা বিশাখসেন সদলবলে দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন। দুই রাজরথ নিকটবর্তী হলে কনকবর্মা বললেন, নমস্কার সখা বিশাখসেন, স্বাগতম্। বিদর্ভ রাজ্যের সর্বত্র কুশল তো? চতুর্বর্ণের প্রজা ও গবাদি পশু বৃদ্ধি পাচ্ছে তো? ধনধান্যের ভাণ্ডার পূর্ণ আছে তো? তোমার মহিষী আমার শ্যালিকা বিংশতিকলা ভাল আছেন তো?

প্রতিনমস্কার করে বিশাখসেন বললেন, অহো কি সৌভাগ্য যে এই দুর্গম পথে প্রিয়সখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! মহারাজ, তোমার শুভেচ্ছার প্রভাবে আমার রাজ্যের সর্বত্র কুশল। কলিঞ্জর রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল তো? তোমার মহিষী আমার শ্যালিকা কম্বুকঙ্কণা ভাল আছেন? সখা, এখন দয়া করে পথ ছেড়ে দাও, তোমার রথটি

এই গিরিসংকটের একটু উত্তরে সরিয়ে রাখ। আমি সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাই, তার পর তুমি তোমার সেনা নিয়ে অভীষ্ট স্থানে যাত্রা ক'রো।

কনকবর্মা মাথা নেড়ে বললেন, তা হতেই পারে না, আমি তোমার চাইতে বয়সে বড়, আমার অশ্ব-রথ-গজাদিও বেশী, অতএব পথের অগ্রাধিকার আমারই। তুমিই একটু দক্ষিণে হটে গিয়ে আমাকে পথ ছেড়ে দাও।

বিশাখসেন বললেন, অন্যায় বলছ সখা। তুমি বয়সে একটু বড় হতে পার, তোমার অশ্ব-গজাদিও প্রচুর থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিদর্ভ রাজ্য অতি সমৃদ্ধ ও বিশাল, তার মধ্যে চারটে কলিঙ্গরের স্থান হয়। অতএব তুমিই আমাকে পথ দাও।

অনেক ক্ষণ এই রকম তর্কবিতর্ক চলল। তার পর কনকবর্মা বললেন, ওহে বিশাখসেন, তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। এই শরাসন স্পর্শ করে শপথ করছি, কিছুতেই তোমাকে আগে যেতে দেব না, তোমার পূর্বেই আমি দক্ষিণে অগ্রসর হব। যখন মিষ্টবাক্যে বিবাদের মীমাংসা হল না তখন যুদ্ধই করা যাক। এই বলে তিনি তাঁর ধনুতে শরসন্ধান করলেন।

বিশাখসেন বললেন, ওহে কনকবর্মা, আমিও শপথ করছি, বাহু-বলে আমার পথ করে নেব, তোমার পূর্বেই আমি উত্তর দিকে যাত্রা করব। এই বলে তিনি ধনুতে শরযোজনা করে জ্যাকর্ষণ করলেন।

তখন দুই রাজবয়স্য কহোড়ভট্ট আর বিড়ঙ্গদেব একযোগে হাত তুলে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভো নৃপতিযুগল, থামুন থামুন। মনে নেই, গত বৎসর মকরসংক্রান্তির দিনে আপনারা নর্মদায় স্নানের পর অগ্নিসাক্ষী করে মৈত্রীবন্ধন করেছিলেন? অপি চ, তখন উষ্ণীষ বিনিময় করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কিছুতেই আপনাদের সৌহার্দ ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না।

কনকবর্মা গালে হাত দিয়ে বললেন, হুঁ, ওই রকম একটা প্রতিজ্ঞা করা গিয়েছিল বটে।

বিশাখসেন বললেন, হুঁ, আমারও সে কথা মনে পড়ছে। তাই তো, এখন কি করা যায়? এক দিকে সৌহার্দরক্ষার প্রতিজ্ঞা, আর এক দিকে অগ্রযাত্রার শপথ। দুটোই বজায় থাকে কি করে? মহারাজ কনকবর্মা, তোমার মুখ্যমন্ত্রীকে সংবাদ পাঠাও, তিনি এখনই এখানে চলে আসুন। আমিও আমার মহামন্ত্রীকে আনাচ্ছি। দুই মন্ত্রী যুক্তি করে এমন একটা উপায় স্থির করুন যাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা আর শপথ রক্ষিত হয়, মর্যাদারও হানি না হয়।

কনকবর্মা তাঁর এক অশ্বারোহী অনুচরকে বললেন, খেটকসিংহ, তুমি এখনই দ্রুতবেগে গিয়ে আমার মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এস। বিশাখসেন, তুমিও লোক পাঠাও।

কহোড়ভট্ট বললেন, তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, অনর্থক বিলম্ব হবে। আমার পরম বন্ধু মহাপণ্ডিত বিড়ঙ্গদেব এখানে রয়েছেন, আমারও বিদ্যাবুদ্ধির প্রচুর খ্যাতি আছে। আমরা দুজনেই রাজবয়স্য। ঠিক মন্ত্রী না হই, উপমন্ত্রী তো বটেই। পত্নীর স্থান অন্তঃপুরে, পথে তিনি বিবর্জিতা, উপপত্নীই প্রবাসসঙ্গিনী হয়ে থাকেন। তদ্রূপ মন্ত্রীর স্থান রাজধানীতে, কিন্তু পর্যটনে ও ব্যসনে উপমন্ত্রীই সহায়। আমরাই মন্ত্রণা করে কিংকর্তব্য স্থির করতে পারব।

দুই রাজা বললেন, উত্তম কথা, তাই কর। কিন্তু বিলম্ব না হয়, বেলা পড়ে আসছে।

কহোড় আর বিড়ঙ্গ রথ থেকে নেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, তার পর একটি শিলাপট্টে বসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। অনেক ক্ষণ পরে কহোড় বললেন, হে নরপতিদ্বয়, শুনতে আজ্ঞা হক। আমরা দুই বন্ধুতে মিলে আপনাদের সমস্যার একটি উত্তম সমাধান

স্থির করেছি, তাতে সৌহার্দের প্রতিজ্ঞা, অগ্রযাত্রার শপথ, এবং উভয়ের মর্যাদা সমস্তই রক্ষা পাবে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে দুই রাজা বললেন, কি প্রকার সমাধান?

কহোড় বললেন, মহারাজ কনকবর্মা, আপনি রাজধানী থেকে এক দল নিপুণ খনক আনান, তারা এই অগস্ত্যদ্বারের তলা দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ খনন করুক। সেই সুড়ঙ্গপথে আপনি দক্ষিণ দিকে এবং উপরের পথে বিদর্ভরাজ বিশাখসেন উত্তর দিকে একই মুহূর্তে যাত্রা করবেন।

বিশাখসেন বললেন, যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু পর্বতের নীচে সুড়ঙ্গ করতে অন্তত এক বৎসর লাগবে। তত দিন আমরা কি করব? রথ থেকে আমি কিছুতেই নামব না তা বলে দিচ্ছি।

কহোড় বললেন, নামবেন কেন। রথে আরূঢ় থেকেই একটু কষ্ট করে এক বৎসর কাটিয়ে দেবেন, ওখানেই শৌচ-স্নানাদি পান-ভোজনাদি অক্ষক্রীড়াদি করবেন, ওখানেই নিদ্রা যাবেন। রাজধানী থেকে নর্তকীদের আনিয়ে নিন, তারা নৃত্যগীত করে আপনাদের চিত্ত-বিনোদন করবে।

কনকবর্মা বললেন, সুড়ঙ্গ টুড়ঙ্গ চলবে না। বিশাখসেন উপর দিয়ে যাবেন আর আমি মূষিকের ন্যায় তাঁর নীচে দিয়ে যাব এ হতেই পারে না।

বিড়ঙ্গ বললেন, মহারাজ কনকবর্মা, আর এক উপায় আছে। আপনি কুবেরের আরাধনা করুন যাতে তিনি তুষ্ট হয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পুষ্পক বিমানটি পাঠিয়ে দেন। সেই বিমানে আপনি আকাশমার্গে দক্ষিণ দিকে যাবেন এবং বিদর্ভরাজ গিরিসংকট দিয়ে উত্তর দিকে যাবেন।

বিশাখসেন বললেন, উনি আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবেন

তা হতেই পারে না। তোমরা দুজনেই অত্যন্ত মুর্খ, সমস্যার সমাধান তোমাদের কর্ম নয়।

বিড়ঙ্গ বললেন, মহারাজ, ধৈর্য ধরুন, আমরা আর এক বার মন্ত্রণা করছি।

দুই রাজবয়স্য আবার মন্ত্রণায় নিবিষ্ট হলেন, দুই রাজা অধীর হয়ে রথের উপর তাঁদের ধনুক ঠুকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কহোড় বললেন, হে নৃপতিযুগল, এবারে আমরা একটি অতি সাধু বিচিত্র ও যশস্কর সমাধান আবিষ্কার করেছি।

কনকবর্মা বললেন, বলে ফেল।

কহোড় বললেন, প্রথমে আপনাদের দুই রথের ঘোড়া খুলে ফেলা হবে, তা হলে এই সংকীর্ণ স্থানেও অনায়াসে রথ ঘোরানো যাবে। ঘোরাবার পর আবার ঘোড়া জোতা হবে, তখন দুই রথের মুখ বিপরীত দিকে থাকবে।

বিশাখসেন সক্রোধে বললেন, আমরা পরাঙ্মুখ হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাব এই তুমি বলতে চাও?

—না না মহারাজ, ফিরবেন কেন। ঘোরাবার পর দুই রথ একটু পশ্চাতে সরে আসবে যাতে ঠেকাঠেকি হয়। তার পর মহারাজ কনকবর্মা পিছন দিক থেকে পা বাড়িয়ে টুপ করে বিদর্ভরাজের রথে উঠবেন এবং বিদর্ভরাজ কলিঞ্জরপতির রথে উঠবেন।

দুই রাজা সমস্বরে বললেন, তার পর, তার পর?

—রথ বদলের পর আর কোনও ভাবনা নেই। আপনারা যুগপৎ বিপরীত দিকে অর্থাৎ আপনাদের অভীষ্ট মার্গে যাত্রা করবেন।

কনকবর্মা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্যদলের কি হবে?

—তাদেরও বদল হবে। আপনার আগে আগে বিদর্ভসেনা এবং

মহারাজ বিশাখসেনের আগে আগে কলিঞ্জরসেনা যাবে। তারা মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

কনকবর্মা বললেন, সখা, সম্মত আছ?

বিশাখসেন বললেন, আমার সেনা তোমার হবে এবং তোমার সেনা আমার হবে এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু বেলা যে শেষ হয়ে এল, মৃগয়া কখন করব?

কহোড় বললেন, আজ মৃগয়া নাই করলেন মহারাজ। আজ আপনাদের প্রতিজ্ঞা আর শপথ রক্ষিত হক, মৃগয়া এর পরে এক দিন করবেন।

বিশাখসেন বললেন, কিন্তু আজ যেতে যেতেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আমাদের অভিযানের শেষ হবে কোথায়? ফিরব কখন?

কহোড় বললেন, ফিরবেন কেন। কিছু ভাববেন না, সবই আমরা স্থির করে ফেলেছি। আপনাদের রাজ্যেরও বিনিময় হবে। মহারাজ কনকবর্মা বিদর্ভসেনার সঙ্গে যাত্রা করে বিদর্ভরাজ্যে অধিষ্ঠিত হবেন, এবং মহারাজ বিশাখসেন কলিঞ্জরসেনার সঙ্গে গিয়ে কলিঞ্জর-সিংহাসন অধিকার করবেন।

কিছু কাল স্তব্ধ হয়ে থাকার পর কনকবর্মা বললেন, অতি জটিল ব্যবস্থা। আমাদের পিতৃপিতামহের রাজ্য হস্তান্তরিত হবে এ যে বড় বিশ্রী কথা।

কহোড় বললেন, মহারাজ, ক্ষত্রিয় নৃপতির প্রধান কর্তব্য প্রতিজ্ঞা, শপথ আর আত্মমর্যাদা রক্ষা, তার জন্য যদি রাজ্য বা প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাও শ্রেয়। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় আপনাদের রাজ্যনাশ বা প্রাণনাশ কিছুই হচ্ছে না, এক রাজ্যের পরিবর্তে আর এক রাজ্য পাচ্ছেন।

কনকবর্মা বললেন, এই বারে বুঝেছি। সখা, তুমি সম্মত আছ?

বিশাখসেন বললেন, অন্য উপায় তো দেখছি না। বেশ, তাই হক।

সেকালের রথ কতকটা একালের এক্কার মতন। দুটি মাত্র চাকা, হালকা গড়ন, বেশী জায়গা নিত না। সারথি সামনে বসত, তার পাশে বা পিছনে রথী বসতেন। দুই রাজার আদেশে রথের ঘোড়া খুলে ফেলা হল। বোম খাড়া করে তুলে সেই সংকীর্ণ স্থানে সহজেই রথ ঘোরানো গেল। তার পর আবার ঘোড়া জোতা হল। একটু পিছনে হটাতেই দুই রথের পিছন দিক ঠেকে গেল, তখন রাজারা না নেমেই এক রথ থেকে অন্য রথে উঠলেন। দুই রাজ-বয়স্যও নিজ নিজ প্রভুর পশ্চাতে বসলেন।

অনন্তর কনকবর্মা পিছনে ফিরে বললেন, হে কলিঞ্জরসৈন্যগণ, ব্যাবর্তধ্বম্ (অর্থাৎ right about turn)। এখন থেকে তোমরা মহারাজ বিশাখসেনের অধীন, উনি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে কলিঞ্জর রাজ্য অধিকার করবেন। আমিও বিদর্ভসেনার সঙ্গে গিয়ে বিদর্ভ রাজ্য অধিকার করব।

বিশাখসেনও অনুরূপ ঘোষণা করলেন।

সৈন্যরা অতি সুবোধ, সমস্বরে বললে, রাজাদেশ শিরোধার্য। তার পর কনকবর্মা আর বিশাখসেন একযোগে আজ্ঞা দিলেন, গম্যতাম্ (অর্থাৎ march)। বিদর্ভসেনা বিদর্ভের দিকে চলল, কনকবর্মার রথ তাদের পিছনে গেল। কলিঞ্জরসেনা কলিঞ্জরে ফিরে চলল, বিশাখসেনের রথ তাদের পিছনে গেল।

যেতে যেতে কনকবর্মা তাঁর বয়স্যকে বললেন, কাজটা কি ভাল হল? রাজ্য বদলের ফলে বিশাখসেনের লাভ আর আমার ক্ষতি হবে। আমার মহিষী তার মহিষীর চাইতে ঢের বেশী সুন্দরী।

কহোড় বললেন, মহারাজ, আপনি যে লোকবাহ্য কথা বলছেন, পরস্ত্রীকেই লোকে বেশী সুন্দরী মনে করে। সর্ব বিষয়ে আপনারই লাভ অধিক হবে। বিদর্ভমহিষী পুত্রবতী, কিন্তু আপনার মহিষী এখনও অনপত্যা। বিদর্ভরাজ্যের ধনভাণ্ডারও অতি বিশাল। ওখানকার অধিপতি হয়ে আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করবেন।

কনকবর্মা যখন বিদর্ভরাজ্যে পেঁছিলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাঁর আদেশে কয়েক জন অশ্বারোহী আগেই রাজধানীতে গিয়ে সংবাদ দিয়েছিল যে রাজ্য বদল হয়ে গেছে, নূতন রাজা আসছেন। কনকবর্মা দেখলেন, তাঁর সংবর্ধনার কোনও আয়োজন হয় নি, পথে আলোকসজ্জা নেই, শাঁখ বাজছে না, হুলুধ্বনি হচ্ছে না, কেউ লাজ-বর্ষণও করছে না। তিনি অপ্রসন্ন মনে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রথ থেকে নামলেন। কয়েকজন রাজপুরুষ নীরবে নমস্কার করে তাঁকে সভাগৃহে নিয়ে গেল, কহোড়ভট্টও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলা গম্ভীরমুখে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে অভিবাদন করে কনকবর্মা বললেন, পট্টমহিষী, ভাল আছেন তো? পাঁচ বৎসর পূর্বে আপনার বিবাহসভায় আপনাকে তন্বী দেখেছিলাম। এখন আপনি একটু স্থূলাঙ্গী হয়ে পড়েছেন, তাতে আপনার রূপ ষোল কলা পেরিয়ে কুড়ি কলায় পেঁছে গেছে। সকল সমাচার শুনেছেন বোধ হয়। এখন আমিই এই বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি, অভিষেকের ব্যবস্থা কাল হবে। আমি আর আমার বয়স্য এই কহোড়ভট্ট অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছি, আজ ক্ষমা করুন, কাল আপনার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করব। এখন আমাদের বিশ্রামাগার দেখিয়ে দিন এবং সত্বর আহারের ব্যবস্থা করুন।

একজন সশস্ত্র রাজপুরুষকে সম্বোধন করে মহিষী বিংশতিকলা বললেন, ওহে কোষ্ঠপাল, এই ধৃষ্ট নির্বোধ রাজা আর তার সহচরকে

কারাগারে নিক্ষেপ কর। এদের শয়নের জন্য কিছু খড় আর ভোজনের জন্য প্রত্যেককে এক সরা ছাতু আর এক ভাঁড় জল দিও।

কহোড়ভট্ট করজোড়ে বললেন, সে কি রানী-মা, আমাদের এই পরমভট্টারক শ্রীশ্রীমহারাজ আপনার ভগ্নীপতি তো বটেনই, এখন বিদর্ভপতি হয়ে অধিকন্তু আপনার পতিও হয়েছেন। এঁকে ছাতু খাওয়াবেন কি করে? ইনি নিত্য নানা প্রকার চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আহার করে থাকেন।

বিংশতিকলা বললেন, তাই হবে। ওহে কোষ্ঠপাল, এই রাজ-মূর্খকে দু মুঠো ছোলা, এক ছড়া তেঁতুল, একটু গুড়, আর এক ভাঁড় ঘোল দিও। ছোলা চিবুবে, তেঁতুল চুষবে, গুড় চাটবে, আর ঘোলের ভাঁড়ে চুমুক দেবে।

কোষ্ঠপাল বললেন, যথা আজ্ঞা মহাদেবী। আরক্ষিগণ, এঁদের কারাগারে নিয়ে চল।

কনকবর্মা হতভম্ব হয়ে নীরবে কারাগৃহে গেলেন এবং ক্লান্ত-দেহে বিষণ্নমনে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বললেন, ওহে পণ্ডিতমূর্খ কহোড়, তোমাদের মন্ত্রণা শুনেই আমার এই দুর্দশা হল। এই শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার পাব কি করে?

কহোড় বললেন, মহারাজ, ভাববেন না। আমি সারা রাত চিন্তা করে উপায় নির্ধারণ করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কনকবর্মা বললেন, তোমার উপর আর ভরসা নেই। বিশাখসেন কেমন আছেন কে জানে, তিনি হয়তো কলিঞ্জর রাজ্যে খুব সুখে আছেন।

কহোড় বললেন, মনেও ভাববেন না তা। আমাদের মহাদেবী কম্বুকঙ্কণাও বড় কম যান না।

এই সময়ে একজন প্রহরী কারাকক্ষে এসে বললে, আপনারা শৌচ-স্নানাদির জন্য ওই প্রাচীরবেষ্টিত উপবনে যেতে পারেন।

কহোড় বললেন, বৎস প্রহরী, শৌচাদি এখন মাথায় থাকুক, একবার রানী-মার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও, মহারাজ তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

প্রহরী বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

রাজমহিষী বিংশতিকলার কাছে এসে কহোড় কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহাদেবী, ঢের হয়েছে, আমাদেব মুক্তি দিন, ফিরে গিয়েই বিদর্ভরাজ বিশাখসেনকে পাঠিয়ে দেব।

মহিষী বললেন, আগে তিনি আসুন, তার পর তোমাদের মুক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

—তবে কেবল আমাকে মুক্তি দিন, আমি কলিঞ্জরে গিয়ে বদলা-বদলির ব্যবস্থা করব।

—বেশ, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, যাতায়াতের জন্য একটা রথও দিচ্ছি। কিন্তু যদি সাত দিনের মধ্যে ফিরে না এস তবে তোমার প্রভুকে শূলে দেব।

কহোড়ভট্ট রথে চড়ে যাত্রা করলেন। এই সময়ে বিড়ঙ্গদেবও বিশাখসেনের দূত হয়ে বিদর্ভরাজ্যে আসছিলেন। মধ্যপথে দুই বন্ধুতে দেখা হয়ে গেল। কুশলপ্রশ্নের পর দুজনে অনেক ক্ষণ মন্ত্রণা করলেন, তার পর যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে গেলেন।

বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলাকে কহোড় বললেন, মহাদেবী, আমার প্রিয়বন্ধু বিড়ঙ্গদেবের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই ব্যবস্থা করেছি যে কাল প্রাতঃকালে মহারাজ বিশাখসেন কলিঞ্জব থেকে বিদর্ভ রাজ্যে যাত্রা করবেন, এবং এখান থেকে মহারাজ কনকবর্মাও কলিঞ্জরে যাত্রা করবেন। যত ইচ্ছা রক্ষী সৈন্য আমাদের সঙ্গে দেবেন। অগস্ত্যদ্বারে

উপস্থিত হয়ে যদি তারা দেখে যে মহারাজ বিশাখসেন আসেন নি, তবে আমাদের ফিরিয়ে আনবে।

মহিষী বললেন, ফিরিয়ে এনেই তোমাদের শূলে চড়াবে। বেশ, তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি, কাল প্রভাতে যাত্রা ক'রো।

পরদিন প্রাতঃকালে কনকবর্মা ও কহোড়ভট্ট রথে চড়ে যাত্রা করলেন, এক দল অশ্বারোহী সৈন্য তাঁদের সঙ্গে গেল। অগস্ত্যম্বারের দক্ষিণ মুখে এসে কনকবর্মা দেখলেন, বিশাখসেন ও বিড়ঙ্গদেব উত্তর মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

উল্লসিত হয়ে বিশাখসেন বললেন, সখা কনকবর্মা, আমার বিদর্ভ রাজ্যে সুখে ছিলে তো? এত রোগা হয়ে গেছ কেন? তোমার সেবার ত্রুটি হয় নি তো?

কনকবর্মা বললেন, কোনও ত্রুটি হয় নি, তোমার মহিষী বিংশতিকলা যেমন রসিকা তেমনি গুণবতী। উঃ, কি যত্নই করেছেন! কিন্তু তোমাকেও তো বায়ুভুক্ তপস্বীর মতন দেখাচ্ছে। আমার কলিঙ্গর রাজ্যে তোমার যথোচিত সৎকার হয়েছিল তো?

অট্টহাস্য করে বিশাখসেন বললেন, সখা, আশ্বস্ত হও, সৎকারের কোনও ত্রুটি হয় নি। তোমার মহিষী কম্বুকঙ্কণাও কম রসিকা আর গুণবতী নন, তিনি আমাকে বিচিত্র চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় খাইয়েছেন। কিছুতেই ছাড়বেন না, তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তবে চলে আসতে পেরেছি। যাক সে কথা। আমরা এই অগস্ত্যম্বারে আবার মুখোমুখি হয়েছি। কে আগে যাত্রা করবে?

কহোড়ভট্ট আর বিড়ঙ্গদেব বললেন, দোহাই মহারাজ, আর বিবাদ করবেন না, আপনাদের যাত্রার ব্যবস্থা আমরাই করে দিচ্ছি।

ওহে সারথিদ্বয়, তোমরা ঠিক গত বারের মতন রথ ঘুরিয়ে ফেল।... হয়েছে তো?... মহারাজ কনকবর্মা, এখন আপনি এ রথ থেকে ও রথে উঠুন। মহারাজ বিশাখসেন, আপনিও ও রথ থেকে এ রথে আসুন। মহামুনি অগস্ত্যের প্রসাদে এবং এই কহোড়-বিড়ঙ্গের বুদ্ধিবলে আপনারা সংকটমুক্ত হয়েছেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞা শপথ মর্যাদা রাজ্য প্রাণ আর ভার্যা সবই রক্ষা পেয়েছে। এখন আর বিলম্ব নয়, দুই রথ যুগপৎ দুই দিকে শুভযাত্রা করুক।

১৩৫৯

ষষ্ঠীর কৃপা

ষষ্ঠীপূজোর পর সুকুমারী তার ছেলেকে পিঁড়ির ওপর শুইয়ে রেখে স্বামীকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। সুকুমারীর বয়স চব্বিশ, তার স্বামী গোকুল গোস্বামীর চুয়ান্ন।

গোকুলবাবু বললেন, ইঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে সুকু, যেন উর্বশী স্নান করে সমুদ্র থেকে উঠে এলেন!

সুকুমারী হাত জোড় করে বললে, তোমার পায়ে পড়ি এইবার আমাকে রেহাই দাও। সাত বৎসর তোমার কাছে এসেছি, তার মধ্যে ছটি সন্তান প্রসব করেছি। পাঁচটি গেছে, একটি এখনও বেঁচে আছে। আমি আর পারি না, শরীর ভেঙে গেছে। আবার যদি পোয়াতী হই তো মরব, এই খোকাও মরবে।

গোকুলবাবু সহাস্যে বললেন, বালাই, মরবে কেন। সন্তান জন্মায়, বাঁচে, মরে, সবই ভগবানের ইচ্ছা, অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্ম-ফল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার ফলভোগ শেষ হয়েছে, ফাঁড়া কেটে গেছে, এখন আর কোনও ভয় নেই।

গোকুলচন্দ্র গোস্বামী শেওড়াগাছির সবরেজিস্ট্রার। খুব আরামের চাকরি, কাজ কম, তাঁর বসতবাড়ির কাছেই কাছারি। গোকুলবাবু পণ্ডিত লোক, অনেক শাস্ত্র জানেন, বাংলা ইংরেজী নভেলও বিস্তর পড়েছেন। অবস্থা ভাল, দেবত্র সম্পত্তি আছে, বেনামে তেজারতিও করেন। সাত বৎসর পূর্বে ইনি হিমালয়ের সমস্ত তীর্থ পর্যটনের পর মানস সরোবর আর কৈলাস দর্শন করেছিলেন। ফিরে এসে ঘোষণা করলেন যে তাঁর জন্মান্তর হয়েছে, আগেকার

স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা চলবে না, নতুন সংসার পাতবেন। তার কোনও বাধা হল না, অত্যন্ত গরিবের মেয়ে অনাথা সুকুমারী তাঁর ঘরে এল। প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাত্যায়নী তিন ছেলে নিয়ে কলকাতায় তাঁর ভাইএর বাড়িতে গিয়ে রইলেন। স্বামীর কাছ থেকে কিছু মাসহারা পান, তা ছাড়া কোনও সম্বন্ধ নেই। দুই মেয়ের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল, তারা শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

স্বামীর প্রবোধবাক্য শুনে সুকুমারী বললে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিও না। কাগজে পড়েছি জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় বেরিয়েছে, দিল্লির মন্ত্রীরাও তা ভাল মনে করেন। তুমি এত খবর রাখ, এটা জান না? কলকাতায় গিয়ে মন্ত্রীদের কাছ থেকে শিখে এস।

গোকুলবাবু বললেন, তাবা ছাই জানে।

—তবে বড় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনি তো শুনেছি ডাক্তার।

—পাগল হয়েছ নাকি সুকু? ছি ছি ছি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-বংশের কুলবধূর মুখে এই কথা! অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, একটুখানি লেখাপড়া শিখে খববেব কাগজ পড়ে এইসব পাপচিন্তা তোমার মাথায় ঢুকেছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মরোধ কবা একটা মহাপাপ তা জান? প্রজাবৃদ্ধিব জন্যই ভগবান স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। গর্ভধারণ হচ্ছে স্ত্রীজাতিব বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য। ভগবানের এই বিধানের ওপর হাত চালাতে চাও?

—শুনেছি আজকাল ঘরে ঘরে চলছে, তাই প্রাণের দায়ে বলছি। আমি মুখ্খু মানুষ, কিছুই জানি না, ন্যায়-অন্যায়ও বুঝি না, কিন্তু ভগবানের ওপর হাত না চালায় কে? ভগবান লেংটা করে পাঠিয়েছিলেন, কাপড় পরছ কেন? দাড়ি কামাও কেন? দাঁত বাঁধিয়েছ কেন?

—রাধামাধব! এসব কথা মুখে এনো না সুকু, জিব খসে যাবে।

—দিল্লির মন্ত্রীদের তো খসে না।

—খসবে, খসবে, পাপের মাত্রা পূর্ণ হলেই খসবে। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তা পালন করলে ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করা হয় না, তার বাইরে গেলেই মহাপাপ। এইটে জেনে রেখো যে ভাগ্যের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। তোমার সন্তানভাগ্য মন্দ ছিল তাই এত দিন দুঃখ পেয়েছ, ভাগ্য পালটালেই তুমি সুখী হবে। যা বিধিলিপি তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। এসব বড় গূঢ় কথা, একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

সুকুমারী হতাশ হয়ে চুপ করে রইল।

ছ মাস যেতে না যেতে সুকুমারী আবার অন্তঃসত্ত্বা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগে পড়ল। ডাক্তার জানালেন, অতি বিশ্রী অ্যানিমিয়া, তার ওপর নানা উপসর্গ; কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যদি ভাল চিকিৎসা করানো হয় তবে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। ডাক্তারের কথা উড়িয়ে দিয়ে গোকুলবাবু বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না সুকু, জ্যোতিঃশাস্ত্রী মশায়ের মাদুলিটি ধারণ করে থাক আর বিধু ডাক্তারের গ্লোবিউল খেয়ে যাও, দু দিনে সেরে উঠবে।

পুজোর আগে গোকুলবাবু সুকুমারীকে বললেন, অনেক কাল বাইরে যাই নি, শরীরটা বড় বেজুত হয়ে পড়েছে। পুজোর বন্ধের সঙ্গে আরও সাত দিন ছুটি নিয়েছি, মোক্তার নরেশবাবুরা দল বেঁধে রামেশ্বর পর্যন্ত যাচ্ছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে ঘুরে আসব। তুমি ভেবো না, ঠিকে ঝি রইল, ছোঁড়া চাকর গুপে রইল, গয়লা-বউও রোজ দু বেলা তোমাকে দেখে যাবে। আমি কালীপুজোর কাছাকাছি ফিরে আসব।

গোকুলবাবু চলে যাবার কিছু দিন পরেই সুকুমারী একবারে শয্যা নিলে। কোনও রকমে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় তার বোধ হল, দম বন্ধ হয়ে আসছে, ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে অথচ সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। খোকা পাশেই শুয়ে আছে। তার মাথায় হাত দিয়ে সুকুমারী মনে মনে বললে, মা জগদম্বা, আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার ছেলেকে কে দেখবে? হে মা ষষ্ঠী, দয়া কর, দয়া কর, আমার খোকাকে রক্ষা কর।

সহসা ঘর আলো করে ষষ্ঠীদেবী সুকুমারীর সামনে আবির্ভূত হলেন। মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন, কি চাও বাছা?

সুকুমারী বললে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মা। শুনেছি তোমার ইচ্ছায় সন্তান জন্মায়, তোমার দয়াতেই বাঁচে, যিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে থাকেন তুমিই সেই দেবী। মা গো, আমি যাচ্ছি, আমার ছেলেটাকে দেখো।

সুকুমারীব কপালে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দেবী বললেন, তোমার ছেলের ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমও। সুকুমারী ঘুমিয়ে পড়ল।

ষষ্ঠীদেবী ডাকলেন, মেনী!

একটি প্রকাণ্ড বেরাল সামনে এল। ধপধপে সাদা গা, মাথার লোম কাল, মাঝে সরু সিঁথি, ল্যাজে সারি সারি চুড়ির মতন দাগ। পিছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু পা জোড় করে মেনী বললে, কি আজ্ঞা করছেন মা?

—তুই এই খোকার ভার নে।

—আমি যে বেরাল মা!

—তুই মানুষ হয়ে যা।

নিমেষের মধ্যে মেনীর রূপান্তর হল। একটি সুশ্রী যুবতী আবির্ভূত হয়ে বললে, মা, আমি খোকার ভার নিচ্ছি। কিন্তু আমারও তো বাচ্চা আছে, তাদের দশা কি হবে? আগেকার গুলোর জন্যে ভাবি না, তারা বড় হয়েছে, গেরস্ত বাড়িতে এঁটো খেয়ে, চুরি করে, ছুঁচো ইঁদুর উচ্চিংড়ে ধরে যেমন করে হক পেট ভরাতে পারবে। কিন্তু চারটে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা আছে যে, এখনও চোখ ফোটে নি, তাদের উপায় কি হবে?

—তুই মাঝে মাঝে বেরাল হয়ে তাদের খাওয়াবি।

—কিন্তু বাড়ির কর্তা কি ভাববে? গোসাঁই যদি দেখে ফেলে তবে মহা গণ্ডগোল হবে যে!

—তোর কোনও ভয় নেই। যদি দেখেই ফেলে তবে গোসাঁইও বেরাল হয়ে যাবে।

—আবার তো মানুষ হবে?

—না না, চিরকালের মতন বেরাল হয়ে যাবে, কোনও ফেসাদ বাধাতে পারবে না। তোকেও বেশী দিন আটকে থাকতে হবে না, এই ছেলের একটা সুরাহা হয়ে গেলেই তুই ছাড়া পাবি।

দেবী অন্তর্হিত হলেন। সুকুমারীর খোকা জেগে উঠে কাঁদতে লাগল, মেনী তাকে বুকে তুলে নিলে। বুভুক্ষু খোকা প্রচুর স্তন্য পেয়ে আনন্দে কাকলি করে উঠল।

একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গোকুলবাবু ফিরে এসেছেন, পরশু তাঁকে কাজে যোগ দিতে হবে। তিনি হাঁকডাক আরম্ভ করলেন—গুপে কোথায় গেলি রে, জিনিস গুলো নামিয়ে নে না—ঝি এর মধ্যেই চলে গেছে নাকি?

কই, কারও তো সাড়া শব্দ নেই। সুকু কোথায় গো, একবার বেরিয়ে এস না।

কেউ এল না, অগত্যা গাড়োয়ানের সাহায্যে গোকুলবাবু নিজেই তাঁর বিছানা তোরঙ্গ ইত্যাদি নামিয়ে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। তার পর—সুকু ভাল আছ তো? খোকা ভাল আছে? চিঠি লেখ নি কেন?—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

মিটমিটে হ্যারিকেনের আলোয় গোকুলবাবু দেখলেন, একটি সুন্দরী মেয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন, তুমি কে গা?

মেনী বললে, আমার নাম মেনকা, ওঁর দূর সম্পর্কের বোন হই। খবর পেলুম সুকু-দিদির ভারী অসুখ, একলা আছেন, খোকাকে দেখবার কেউ নেই, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম।

গোকুলবাবু কৃতার্থ হয়ে বললেন, আসবে বইকি মেনকা। তা এসেছ যখন, তখন থেকেই যাও। কেমন আছে তোমার দিদি? আহা, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জ্বরটা বেশী নাকি?

—দিদি এইমাত্র মারা গেছেন।

গোকুলবাবু মাথা চাপড়ে বিলাপ করতে লাগলেন—আমাকে একলাটি ফেলে কোথায় গেলে গো, খোকার কি হবে গো, ইত্যাদি। মেনী বললে, চুপ করুন জামাইবাবু, কান্নাকাটি পরে হবে। দেরি করবেন না, লোক ডাকুন, সংকারের ব্যবস্থা করুন। গোকুলবাবু তাই করলেন।

দু দিন পরে গোকুলবাবু বললেন, ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছ মেনকা, তাই দুটো খেতে পাচ্ছি, ছেলেটাও বেঁচে আছে। চমৎকার মেয়ে তুমি। আমি বলি কি, এখানে এসেই যখন আমাদের

ভার নিয়েছ তখন পাকা করেই নাও, গিন্নী হয়ে ঘর আলো করে থাক।

মেনী বললে, ইশ, আপনার যে সবুর সইছে না দেখছি। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, লোকে বলবে কি? দিদির জন্যে শোকটা একটু কমুক, অশৌচ শেষ হক, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাক, তার পর ও কথা বলবেন।

শ্রাদ্ধ চুকে গেল, কিন্তু গোকুলবাবুর স্বস্তি নেই, মেনকার রকম সকম বড় সন্দেহজনক ঠেকছে। চুপ করে থাকতে না পেরে তিনি বললেন, হ্যাঁগা মেনকা, তোমার স্বভাব-চরিত্র তো ভাল মনে হচ্ছে না। আইবুড়ো মেয়ে, বলি তোমাব দুধ আসে কি কবে? আমি দেখেছি তুমি খোকাকে খাওয়াও। ছেলেপিলে হয়েছে নাকি? পষ্ট করে বল বাপু, যতই সুন্দরী হও, নষ্ট মেয়ে আমি বিয়ে কবতে পারব না।

মেনী হেসে বললে, ও, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হয়েছে বুঝি! ভয় নেই গোসাঁই ঠাকুর, আমার চরিত্রে এতটুকু খুঁত পাবে না, আমি একবারে খাঁটী, যাকে বলে অপাপবিদ্ধা। অত শাস্ত্র পড়েছ পয়স্বিনী কন্যার কথা জান না? আমি হচ্ছি তাই। মাঝে মাঝে দুধ আসে, তিন-চার মাস থাকে, আবার দিনকতক বন্ধ হয়। তোমার ভাগ্য ভাল যে এ রকম একটা মেয়ে তোমার ঘবে এসেছে, তাই তোমার আধ-মরা ছেলেটা বেঁচে গেল, নিজের মায়ের দুধ তো ভাল কবে খেতেই পায় নি।

গোকুলবাবুর মনের খুঁতখুঁতনি দূর হল না। কিন্তু মেনকার রূপ তাঁকে জাদু করেছে। ভাবলেন, স্ত্রী রত্নং দুষ্কলাদপি, যা থাকে কপালে, মেনকাকে ছাড়তে পারব না। দু মাস যেতে না যেতেই বিয়ে হয়ে গেল।

গোকুলবাবুর অশান্তি বাড়তে লাগল। মেনকা রোজ রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যায়? রবিবারেও দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, হয়তো রোজই বেরিয়ে যায়। গোকুলবাবু স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন, তৃতীয় পক্ষের রূপসী স্ত্রীকে চটাতে চান না। তবু একদিন বলে ফেললেন, হ্যাঁগা, তুমি মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হও?

মেনকা বললে, সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি তো জেলখানার কয়েদী নই। তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় আড্ডা দিতে যাও আমি কি তা জানতে চাই?

গোকুলবাবু স্থির করলেন, চুপ করে থাকা উচিত নয়, জানতে হবে কার কাছে যায়। তিনি একটা টর্চ কিনে শোবার ঘরে এমন জায়গায় রাখলেন যাতে মেনকা টের না পায় অথচ তিনি চট করে সেটা হাতে নিতে পারেন। রাত্রে তিনি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলেন। মেনকা দুপুর রাতে বিছানা থেকে উঠে নিঃশব্দে বাইরে গেল, গোকুলবাবুও খালি পায়ে তার পিছু নিলেন।

উঠন পার হয়ে খিড়কির দরজা খুলে মেনকা বাড়ির পিছন দিকের একটা ছোট চালা ঘরে ঢুকল। সেখানে কাঠ কয়লা আর ঘুঁটে থাকে। মেনকার পরনে সাদা শাড়ি, সেজন্য অন্ধকারেও তাকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু চালা ঘরের ভেতরে গিয়ে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। টর্চের আলো ফেলে গোকুলবাবু দেখলেন, মেনকা নেই, একটা সাদা বেরাল শুয়ে আছে, চারটে বাচ্চা তার দুধ খাচ্ছে।

চার দিকে আলো ঘুরিয়ে গোকুলবাবু ডাকলেন, মেনকা!

মেনী বললে, কেন? চেঁচিও না, আমার বাচ্চারা ভয় পাবে।

মেনকার রূপান্তর দেখে গোকুলবাবুর মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেল, হাত থেকে টর্চ খসে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারেও তাঁর দৃষ্টি-শক্তি বিশেষ কমল না, তিনি আশ্চর্যও হলেন না, শুধু মর্মাহত হয়ে বললেন, রাধামাধব, ব্রাহ্মণের বাড়িতে জারজ সন্তান!

মেনী বললে, আহা কি আমার ব্রাহ্মণ রে! নিজের মুখটা না হয় দেখতে পাচ্ছ না, পিছনে হাত দিয়ে দেখ না একবার।

গোকুলবাবু পিছনে হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর একটি প্রমাণ সাইজ ল্যাজ বেরিয়েছে। তাতেও তিনি আশ্চর্য হলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, কুলটা মাগী, কতগুলো নাগর আছে তোর?

—অত আমার হিসেব নেই।

—এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

—তুমি আমাকে তাড়াবার কে হে গোসাঁই? জান না, আমাদের হল মাতৃতন্ত্র সমাজ, যাকে বলে ম্যাট্রিআর্কি। আমাদের সংসারে মদ্দাদের সর্দারি চলে না, তারা একবারে উটকো, শুধু ক্ষণেকের সাথী।

গোকুলবাবু প্রচণ্ড গর্জন করে মেনীকে কামড়াতে গেলেন। মেনী এক লাফে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—উর্‌র‍্যাঁও। (মার্জার-ভাষাবিৎ শ্রীদীপংকর বসু মহাশয় বলেন, এই রকম শব্দ করে মার্জার-জননী তার দুরন্ত সন্তানদের আহ্বান করে।)

মেনীর রুচির বৈচিত্র্য আছে, সে হরেক রকম পতির ঔরসে হরেক রকম অপত্য লাভ করেছে। তার ডাক শুনে নিমেষের মধ্যে সাদা কালো পাঁশুটে পাটকিলে ডোরা-কাটা প্রভৃতি নানা রঙের বেরাল ছুটে এসে বললে, কি হয়েছে মা? মেনী বললে, এই বজ্জাত হুলোটাকে দূর করে দে।

মেনীর সাতটা জোয়ান বেটা বাঘের মতন লাফিয়ে হুলোদশা-গ্রস্ত গোকুলবাবুকে আক্রমণ করলে। তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে করুণ রব করে লেংচাতে লেংচাতে পালিয়ে গেলেন।

তিন দিন পরে গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর প্রথমা পত্নী কাত্যায়নী দেবী এই চিঠি পেলেন।—পূজনীয়া বড়দিদি, আমি আপনার অভাগিনী ছোট বোন, তৃতীয় পক্ষের সতিন মেনকা। কাল রাত্রে গোসাঁইজী আমার সংগে ঝগড়া করে বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। যাবার সময় পইতে ছিঁড়ে দিব্যি গেলে বলে গেছেন, আর কদাপি ফিবে আসবেন না, সংসারে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। তাঁর বিষয়সম্পত্তি দেখা আমার সাধ্য নয়, অতএব আপনি পত্রপাঠ আপনার ছেলেদেব নিয়ে এখানে চলে আসুন, নিজের বিষয় দখল করুন। সুকু-দিদি একটি ছেলে রেখে গেছেন, এখন তার বয়স ন-দশ মাস হবে। খাসা ছেলে, দেখলেই আপনার মায়া হবে। আমি আব এখানে থাকব না, আপনি এলেই সব ভার আপনাকে দিয়ে আমাব মায়ের কাছে চলে যাব। ইতি। সেবিকা মেনকা।

কাত্যায়নী দেবি করলেন না, তাঁব ছেলেদের নিয়ে স্বামীর ভিটেয় ফিবে এলেন। সুকুমাবীর ছেলেকে আদর কবে কোলে নিয়ে বললেন, এ আমাবই ছোট খোকা।

মেনকা আশ্চর্য মেয়ে, মোটেই লোভ নেই। কাত্যায়নী তাঁর ছোট সতিনের জন্য একটা মাসহারার ব্যবস্থা করতে চাইলেন, কিন্তু মেনকা বললে, কিচ্ছু দরকার নেই দিদি, আমার মায়ের ওখানে কোনও অভাব নেই। রাহাখরচ পর্যন্ত সে নিলে না। চলে যাবার সময় বললে, দিদি, আপনি সধবা মানুষ, কর্তার খবর পান আর না পান

মাছ অবশ্যই খাবেন, নয়তো তাঁর অমঙ্গল হবে। আর, আমার একটি অনুরোধ আছে—একটা বুড়ো হুলো বেরাল রোজ এ বাড়িতে আসে, তাকে একটু দয়া করবেন, ভাতের সঙ্গে কিছু মাছ মেখে খেতে দেবেন, পারেন তো একটু দুধও দেবেন। আহা, বেচারা অথর্ব হয়ে গেছে।

কাত্যায়নী বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না বোন, তোমার হুলোকে আমি ঠিক খেতে দেব।

১৩৫৯

গন্ধমাদন-বৈঠক

পুরাণে সাত জন চিরজীবীর নাম পাওয়া যায়—অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ, কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ। এঁরা একবার একত্র হয়েছিলেন।

বদরিকাশ্রমের উত্তরপূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। বনবাসকালে ভীম যখন দ্রৌপদীর উপরোধে সহস্রদল পদ্ম আনতে যান তখন গন্ধমাদনে হনুমানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর থেকে হনুমান সেখানেই বাস করছেন।

একটি প্রকাণ্ড অক্ষোট অর্থাৎ আখরোট গাছের নীচে প্রতিদিন অপরাহ্ণে হনুমান বার দিয়ে বসেন। সেই সময় নিকটবর্তী অরণ্যের অধিবাসী বহুজাতীয় বানর ভল্লুক প্রভৃতি বুদ্ধিমান প্রাণী তাঁকে দর্শন করতে আসে। হনুমান নানাপ্রকার বিচিত্র কথা বলেন, তাঁর ভক্তেরা পরম আগ্রহে তা শোনে।

একদিন হনুমান অক্ষোটতরুতলে সমাসীন হয়ে ভক্তবৃন্দের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এমন সময় জাম্ববানের বংশধর একটি বৃদ্ধ ভল্লুক করজোড়ে বললে, প্রভু, আপনার লঙ্কাদহনের ইতিহাসটি আর একবার আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

হনুমান বললেন, সাগরলঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে দেবী জানকীর সঙ্গে দেখা করার পর আমি বিস্তর রাক্ষস বধ করেছিলাম। তার পর ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে কাবু করে ফেললেন। তখন রাক্ষসরা শণ আর বল্কলের রজ্জু দিয়ে আমাকে বেঁধে রাবণের

কাছে নিয়ে চলল। আমি ভাবলাম, এ তো মজা মন্দ নয়, বিনা চেষ্টায় রাবণের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে—

এই পর্যন্ত বলার পর হনুমান দেখলেন, একজন নিবিড়শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর কাছে আসছেন। সভায় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই নিমেষের মধ্যে নিকটস্থ অরণ্যে অন্তর্হিত হল। আগন্তুক হনুমানের কাছে এসে নমস্কার করে বললেন, মহাবীর, আমাকে চিনতে পার?

হনুমান উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে, এ যে দেখছি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ! বহু বৎসর পরে দেখা হল। মহারাজ, সমস্ত কুশল তো? লঙ্কা থেকে কবে এসেছ? এখানে আছ কোথায়?

বিভীষণ বললেন, কাল এসেছি। বদরিকাশ্রমে আমার পত্নীকে রেখে তোমাকে দেখতে এলাম। সমস্ত কুশল, তবে আমার লঙ্কারাজ্য আর নেই।

—সেকি? সিংহল তো রয়েছে।

—সিংহল লঙ্কা নয়, লোকে ভুল করে। লঙ্কা সাগরগর্ভে বিলীন হয়েছে। আমি এখন নিষ্কর্মা, রাজ্যহীন হয়ে ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই, কোনও স্থায়ী আবাস নেই, মহেশ্বর আর রামচন্দ্রের কৃপায় কোনও অভাবও নেই। রাজ্য গেছে তাতে ভালই হয়েছে, আজকাল রাজাদের বড় দুর্দিন চলছে।

—বটে! পৃথিবীর আর সব খবর কি বল। লোকে রামচন্দ্রের কীর্তিকথা ভুলে যায় নি তো?

—ভুলে যায় নি, তোমার খ্যাতিও রামচন্দ্রের চাইতে কম নয়, কিন্তু বাংলা দেশে অন্য রকম দেখেছি।

—কি রকম?

—সেখানকার লোকে রামের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখায়, ভূত

তাড়াবার জন্য রাম রাম বলে, কিন্তু তাঁর পূজো করে না, কেউ কেউ তাঁর নিন্দাও করে। সব চেয়ে দুঃখের কথা, তোমাকে তারা বিদ্রূপ করে। একনিষ্ঠ প্রভুভক্তি আর অলৌকিক বীরত্বের মহিমা বোঝবার শক্তি বাঙালীর নেই।

—তোমার কথা কি বলে?

—সে অতি কুৎসিত কথা। আমাকে বলে—ঘরভেদী বিভীষণ। জয়চাঁদ, মীরজাফর, লাভাল আর কুইসলিংএর দলে আমাকে ফেলেছে। ন্যায় আর ধর্মের জন্যই আমি ভ্রাতাদের সংগে যুদ্ধ করেছি তা কেউ বোঝে না।

এই সময় আর একজন সেখানে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ শীর্ণ মলিন দেহ, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, পরনে চীরবাস, গায়ে কর্কশ কম্বল। এককালে বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। আগন্তুক বললেন, মহাবীর হনুমান আর রাক্ষসরাজ বিভীষণের জয় হক।

হনুমান বললেন, কে আপনি সৌম্য? ব্রাহ্মণ মনে হচ্ছে, প্রণাম করি।

—না না প্রণাম করতে হবে না। আমি ভরদ্বাজের বংশধর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কিন্তু ভাগ্যদোষে পতিত হয়েছি।

হনুমান বললেন, অশ্বত্থামা নাম শুনেছি বটে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস এখানে। কোন্ পাপে তোমার পতন হল?

—সে অনেক কথা। পাণ্ডবরা জঘন্য কপট উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছিল, তারই প্রতিশোধে আমি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলাম, পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভে দারুণ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম। তাই কৃষ্ণ আমাকে শাপ দিয়েছিলেন—নরাধম, তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে

অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পূযশোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। সেই শাপের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন আমি ব্যাধিমুক্ত, ইচ্ছানুসারে সর্ব জগৎ পরিভ্রমণ করি। কিন্তু আমার শান্তি নেই, মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এখন আমার বার্তা শুনুন। ভগবান পরশুরাম আমাকে আজ্ঞা করেছেন, বৎস, সপ্ত চিরজীবী যাতে গন্ধমাদন পর্বতে সমবেত হন তার আয়োজন কর। দৈবক্রমে বিভীষণ এখানে এসে পড়েছেন, আমরা তিন জন একত্র হয়েছি, অবশিষ্ট চার জনকে আমি আহ্বান করেছি। ওই যে, ওঁরাও এসে গেছেন।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বিরোচনপুত্র দৈত্যরাজ বলি, এবং অশ্বত্থামার মাতুল কৃপ উপস্থিত হলেন। হনুমান সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললেন, আজ আমার জন্ম সফল হল, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরাম আমার আশ্রমে পদার্পণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মহাজ্ঞানী মহর্ষি ব্যাস, দানশৌণ্ড মহাকীর্তিমান বলি, এবং সর্বাস্ত্রবিশারদ কৃপাচার্যও এসেছেন। আরও সৌভাগ্য এই যে বহু কাল পরে আমার মিত্র বিভীষণের দর্শন পেয়েছি এবং দ্রোণপুত্র মহারথ অশ্বত্থামাও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সপ্ত চিরজীবী সমবেত হয়েছি, এখন শ্রীপরশুরাম আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে।

পরশুরাম বললেন, তোমরা বোধ হয় জান যে বসুন্ধরার অবস্থা বড়ই সংকটময়। ধর্ম লুপ্ত হয়েছে, সমস্ত প্রজা যুদ্ধের ভয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে। শুনেছি দু-চার জন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধনের চেষ্টা করছেন কিন্তু পেরে উঠছেন না। আমরা এই সপ্ত চিরজীবী অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক কীর্তি

করেছি। মহর্ষি ব্যাসের রসনাগ্রে সমস্ত পুরাণ আর ইতিহাস অবস্থান করছে। দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাস্ত করেছিলেন, অসংখ্য সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা এঁর আছে। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রসমরে অশেষ পরাক্রম দেখিয়েছেন কিন্তু কদাচ ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করেন নি। বিভীষণ আর অশ্বত্থামা দুজনেই মহারথ, অধিকন্তু সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ রাখেন। পবননন্দন হনুমান বাহুবলে চরিত্রগুণে এবং প্রভু-ভক্তিতে অদ্বিতীয়। আর, আমার কীর্তি তো তোমরা সকলেই জান, নিজের মুখে আর বলতে চাই না। এখন আমাদের কর্তব্য, সাত জনে মন্ত্রণা করে এই দারুণ কলিযুগের উপযুক্ত ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বেঁধে দেওয়া।

দৈত্যরাজ বলি বললেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি কিঞ্চিৎ অপ্রিয় সত্য নিবেদন করছি। এক ব্যাসদেব ছাড়া আমরা সকলেই এক কালে অসংখ্য বিপক্ষ বধ করেছি। আমরা কেউ ধর্ম-যুদ্ধ করি নি, অপরাধীর সঙ্গে বিস্তর নিরপরাধ লোককেও বিনষ্ট করেছি। ধর্মযুদ্ধের আমরা কি জানি? ব্যাসদেবও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিবারণ করতে পারেন নি। আসল কথা, ধর্মযুদ্ধ হতেই পারে না, যুদ্ধ মাত্রেই পাপযুদ্ধ। যে বীর যত শত্রু মারেন তিনি তত পাপী।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বলতে চাও আমরা সকলেই পাপী?

—আজ্ঞে হাঁ, ব্যাসদেব ছাড়া। আমাদের মধ্যে শ্রীহনুমান সব চেয়ে কম পাপী, কারণ উনি শুধু হাত পা আর দাঁত দিয়ে লড়েছেন, বড় জোর গাছ আর পাথর ছুড়েছেন। উনি ধনুর্বিদ্যা জানতেন না, দূর থেকে বহু প্রাণী বধ করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হনুমান বুক ফুলিয়ে বললেন, দৈত্যরাজ, তুমি কিছুই জান না।

ধনুর্বাণের কোনও প্রয়োজনই আমার হয় নি, শুধু হাত পা দিয়েই আমি সহস্র কোটি রাক্ষস বধ করেছি।

বিভীষণ বললেন, ওহে মহাবীর, পৌরাণিক ভাষা তুমি তো বেশ আয়ত্ত করেছ! পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন মোটে দু শ কোটি, ত্রেতাযুগে ঢের কম ছিল।

পরশুরাম বললেন, বেশ, মেনে নিচ্ছি হনুমান সব চাইতে কম পাপী। সব চাইতে বড় পাপী কে?

বলি বললেন, আজ্ঞে, সে হচ্ছেন আপনি। একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, শিশুকেও বাদ দেন নি।

পরশুরাম বললেন, দেখ বলি, পিতামহ প্রহ্লাদের প্রশ্রয় আর বিষ্ণুর অনুগ্রহ পেয়ে তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। আমি বহু দিন অস্ত্র ত্যাগ করেছি, নতুবা তোমার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতাম। ধর্মাধর্মের তুমি কতটুকু জান হে দৈত্য? বিষ্ণুক্রান্তা ধরণী থেকে তুমি নির্বাসিত হয়েছ, পাতালে অবরুদ্ধ হয়ে আছ, আজ শুধু আমার অনুরোধে বিষ্ণু তোমাকে দু দণ্ডের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

বলি বললেন, প্রভু পরশুরাম, আপনি অবতার হতে পারেন, কিন্তু আপনার ধর্মাধর্মের ধারণা অত্যন্ত সেকেলে। ওহে অশ্বত্থামা, তুমি তো সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছ, অনেক খবর রাখ, যুদ্ধ সম্বন্ধে এখনকার মনীষীদের মতামত কি শুনিয়ে দাও না।

অশ্বত্থামা বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রের কর্তারা বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত আছি; যদি বিপক্ষ রাষ্ট্র আমাদের কোনও ক্ষতি করে তবে অবশ্যই লড়ব। পক্ষান্তরে কয়েক জন ধর্মপ্রাণ মহাত্মা বলেন, অহিংসাই পরম ধর্ম, যুদ্ধ মাত্রেই অধর্ম। অন্যায় সইবে না, অন্যায়কারীকে প্রাণপণে বাধা দেবে, কিন্তু কদাপি

হিংসার আশ্রয় নেবে না। অহিংস প্রতিরোধের ফলেই কালক্রমে বিপক্ষের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

পরশুরাম বললেন, কলিযুগের বুদ্ধি আর কতই হবে! ঘরে মশা ইঁদুর বা সাপের উপদ্রব হলে যে গৃহস্থ অহিংস হয়ে থাকে তাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়। যারা স্বভাবত দুরাত্মা অহিংস উপায়ে তাদের জয় করা যায় না। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং এই উপদেশ সদাশয় বিপক্ষের বেলাতেই খাটে। দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল কি? যাঁরা এখন অহিংসার প্রচার করছেন তাঁরা যুদ্ধ থামাতে পেরেছেন কি?

অশ্বত্থামা বললেন, আজ্ঞে না। আমি যে অধর্মযুদ্ধ করেছিলাম তার জন্য কৃষ্ণ আমাকে ত্রিসহস্রবর্ষভোগ্য দারুণ শাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের তুলনায় আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র অতি তুচ্ছ। এখন যাঁরা আকাশ থেকে বজ্রময় প্রলয়াগ্নি ক্ষেপণ করে জনপদ ধ্বংস করেন, নির্বিচারে আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র সহস্র নিরপরাধ প্রজা হত্যা করেন, তাঁদের কেউ শাপ দেয় না। আধুনিক বীরগণের তুল্য উৎকট পাপী সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ছিল না।

বলি মৃদুস্বরে বললেন, ছিল। আমাদের এই জামদগ্ন্য পরশুরাম যে একুশ বার ক্ষত্রিয়সংহার করেছিলেন, নৃশংসতায় তার তুলনা হয় না।

পরশুরামের শ্রবণশক্তি একটু ক্ষীণ, বলির কথা শুনতে পেলেন না। বললেন, বীরের পাপপুণ্য বিচার করা অত সহজ নয়। দুষ্ক্রিয়া যখন দেশব্যাপী হয়, অথবা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যখন উপদেশে বা অনুরোধে কোনও ফল হয় না, তখন ঝাড়ে বংশে নির্মূল করাই একমাত্র নীতি, কে দোষী কে নির্দোষ তার বিচারের প্রয়োজন নেই।

বিভীষণ বললেন, একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত (T. H. Huxley) বলেছেন, নীতি হচ্ছে দু রকম, নিসর্গনীতি (cosmic law) আর ধর্মনীতি (moral law)। প্রথমটি বলে, আত্মরক্ষা আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের সর্বনাশ করা যেতে পারে। এই নীতি অনুসারেই লোকে মশা ইঁদুর সাপ বাঘ ইত্যাদি মারে, খাদ্যের জন্য জীবহত্যা করে, লক্ষ লক্ষ কীট বধ করে কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে, সভ্য সবল জাতি অসভ্য দুর্বল জাতিকে পীড়ন বা সংহার করে, যুদ্ধকালে যে-কোনও উপায়ে বিপক্ষকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ধর্মনীতি বলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদাপি পরের অনিষ্ট করবে না, সকলকেই আত্মীয় মনে করবে। কিন্তু কেবল ধর্মনীতি অবলম্বন করে কি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, স্বার্থ আর পরার্থ বজায় রাখা যায়, তার পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। রাজনীতিক পণ্ডিতগণ অবস্থা বুঝে প্রথম বা দ্বিতীয় নীতির ব্যবস্থা করেন, সাধারণ মানুষও তাই করে। তবে ভবিষ্যদ্‌দর্শী মহাত্মারা আশা করেন যে মানবজাতি ক্রমশ নিসর্গনীতি বর্জন করে ধর্মনীতি আশ্রয় করবে। আমাদের এই ভগবান ভার্গব নিসর্গনীতি অনুসারেই একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করেছিলেন।

পরশুরাম বললেন, ঠিক করেছিলাম। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্যই অবতাররা আসেন। তাঁরা চটপট ধর্মসংস্থাপন করতে চান, অগণিত দুর্বুদ্ধি পাপীকে উপদেশ দিয়ে সৎপথে আনবার সময় তাঁদের নেই। এখনকার লোকহিতৈষী যোদ্ধারা যদি অনুরূপ উদ্দেশ্যে নির্মম হয়ে যুদ্ধ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না।

অশ্বত্থামা বললেন, কিন্তু একাধিক প্রবল পক্ষ থাকলে নিসর্গনীতিও জটিল হয়ে পড়ে। সকলেই বলে, অন্যায় উপায়ে যুদ্ধ করা

চলবে না, অথচ ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তারা একমত হতে পারে না। প্রত্যেক পক্ষই বলতে চায়, তাদের যে অস্ত্র আছে তার প্রয়োগ ন্যায়সম্মত, কিন্তু আরও নিদারুণ নূতন অস্ত্রের প্রয়োগ ঘোর অন্যায়।

পরশুরাম বললেন, আমাদের মধ্যে আলোচনা তো অনেক হল, এখন তোমরা নিজের নিজের মত প্রকাশ করে বল—ধর্মযুদ্ধের লক্ষণ কি? কিপ্রকার যুদ্ধ এই কলিযুগের উপযোগী? বলি, তুমিই আগে বল।

বলি বললেন, যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করে নিরন্তর শ্রীহরির নাম কীর্তন করতে হবে, কলিতে অন্য গতি নেই।

পরশুরাম বললেন, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, বামনদেবের তৃতীয় পদের নিপীড়নে তোমার মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে গেছে। বিভীষণ কি বল?

বিভীষণ বললেন, যেমন চলছে চলুক না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম রচনার প্রয়োজন কি। তাতে কোনও ফল হবে না, আমাদের বিধান মানবে কে? অশ্বত্থামা, তোমার মত কি?

অশ্বত্থামা বললেন, তিন হাজার বৎসর শাপ ভোগ করে আমার বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে গেছে, বিচারের শক্তি নেই। আমার পূজ্যপাদ মাতুলকে জিজ্ঞাসা করুন।

কৃপাচার্য বললেন, যুদ্ধের কোনও কথায় আমি থাকতে চাই না। আমি আজকাল সংগীত সাধনা করছি।

হনুমান বললেন, আপনারা ভাববেন না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধন অতি সোজা। সেনায় সেনায় যুদ্ধ এবং সর্ববিধ অস্ত্রের প্রয়োগ একবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। দুই পক্ষের যাঁরা প্রধান তাঁরা মল্ল-যুদ্ধ করবেন, যেমন বালী আর সুগ্রীব, ভীম আর কীচক

করেছিলেন। কিল চড় লাথি দাঁত নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক অস্ত্রের প্রয়োগে আপত্তির কারণ নেই।

বিভীষণ বললেন, মহাবীর, তোমার ব্যবস্থায় একটু ত্রুটি আছে। দুই বীর সমান বলবান না হলে ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। মনে কর, চার্চিল আর স্তালিন, কিংবা ট্রুমান আর মাও-সে-তুং, এঁরা মল্লযুদ্ধ করবেন। এঁদের দৈহিক বলের পাল্লা সমান করবে কি করে?

হনুমান বললেন, খুব সোজা। একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকবেন, যে বেশী বলবান তাকে তিনি প্রথমেই যথোচিত প্রহার দেবেন, যাতে তার বল প্রতিপক্ষের সমান হয়ে যায়।

বিভীষণ বললেন, যেমন ঘোড়দৌড়ের হ্যাণ্ডিক্যাপ।

পরশুরাম বললেন, বৎস হনুমান, কোনও মানুষ তোমার এই বানরিক বিধান মেনে নেবে না। ব্যাসদেব নীরব রয়েছেন কেন, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ওহে ব্যাস, ওঠ ওঠ।

পরশুরামের ঠেলায় মহর্ষি ব্যাসের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি বললেন, আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি। এখন একটু সৃষ্টিতত্ত্ব বলছি শুনুন। ভগবান স্বয়ম্ভু কারণবারি সৃষ্টি করে সপ্ত সমুদ্র পূর্ণ করলেন। কালক্রমে সেই বারিতে সর্বজীবের মূলীভূত প্রাণপঙ্ক উৎপন্ন হল, যার পাশ্চাত্ত্য নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ম্। কোটি বৎসর পরে তা সংহত হয়ে প্রাণকণায় পরিণত হল, এখন যাকে বলা হয় কোষ বা সেল। এই প্রাণকণাই সকল উদ্‌ভিদ আর প্রাণীর আদিরূপ। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই কিন্তু চেষ্টা আছে, অন্তর্লীন আত্মাও আছে। আরও কোটি বৎসর পরে বহু কণার সংযোগের ফলে বিভিন্ন জীবের উদ্‌ভব হল, যেমন ইষ্টকের সমবায়ে অট্টালিকা। প্রাণকণার যে পৃথক প্রাণ আর আত্মা ছিল, জীবশরীরে তা সংযুক্ত হয়ে গেল। ক্রমশ জীবের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি উদ্‌ভূত

হল, কিন্তু বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রইল না, কারণ সর্বশরীরব্যাপী একই প্রাণ আর আত্মা তাদের নিয়ন্তা।

পরশুরাম বললেন, ওহে ব্যাস, তোমার ব্যাখ্যান থামাও বাপু, আমি তোমার শিষ্য নই।

ব্যাস বললেন, দয়া করে আর একটু শুনুন। কালক্রমে জীব-শ্রেষ্ঠ মানুষের উৎপত্তি হল, তারা সমাজ গঠন করলে। ইতর প্রাণীরও সমাজ আছে, কিন্তু মানবসমাজ এক অত্যাশ্চর্য ক্রমবর্ধমান পদার্থ। বিভিন্ন মানুষ কামনা করছে—আমরা সকলে যেন এক হই। এই কামনার ফলে সামাজিক প্রাণ আর সামাজিক আত্মা ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হচ্ছে, ব্যষ্টিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থানে সমষ্টিগত বৃহৎ স্বার্থের উপলব্ধি আসছে। কিন্তু সৃষ্টির ক্রিয়া অতি মন্থর, একত্ববোধ সম্পূর্ণ হতে বহু কাল লাগবে। তার পর আরও বহু কাল অতীত হলে বিভিন্ন মানব সমাজও একপ্রাণ একাত্মা হবে। তখন বিশ্বমানবাত্মক বিরাট পুরুষই সমস্ত সমাজ আর মানুষকে চালিত করবেন, অঙ্গে অঙ্গে যেমন যুদ্ধ হয় না সেইরূপ মানুষে মানুষেও যুদ্ধ হবে না।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তোমার এই সত্যযুগ কত কাল পরে আসবে?

—বহু বহু কাল পরে। তত দিন মানবজাতির বিরোধ নিবৃত্ত হবে না, কিন্তু লোকহিতৈষী মহাত্মারা যদি অহিংসা আর মৈত্রী প্রচার করতে থাকেন তবে তাঁদের চেষ্টার ফলে ভাবী সত্যযুগ তিল তিল করে এগিয়ে আসবে। এখন আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধৈর্য ধরে থাকুন, তার পর আবার এখানে সমবেত হয়ে তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

পরশুরাম বললেন, হুঁ, খুব ধূমপান করেছ দেখছি, দশ-বিশ

হাজার বৎসর বলতে মুখে বাধে না। ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর, তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।

১৩৫৯

it is A VERY FINE STORY BOOK .....
But "Goja KHORY"